বিজ্ঞান জিজ্ঞাসুর ডায়রি

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসুর ডায়েরি

অরূপরতন ভট্টাচার্য

প্রথম দে'জ পরিমার্জিত ও
পরিবর্ধিত সংস্করণ :
আষাঢ়, ১৩৮৮
জুলাই, ১৯৮৮

দ্বিতীয় সংস্করণ :
বৈশাখ, ১৩৯২
এপ্রিল, ১৯৮৫

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
সন্দীপ রায়

মুদ্রাকর :
শম্ভুনাথ চক্রবর্তী
লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস
৪৫-১-এইচ-১৪, মুরারী পুকুর রোড
কলিকাতা ৭০০০৫৪

প্রথম প্রকাশ :
মহালয়া, ১৩৮৩
সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬
দ্বিতীয় সংস্করণ :
২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৪
৮ মে, ১৯৭৭
তৃতীয় সংস্করণ :
২২শে শ্রাবণ, ১৩৮৫
৮ আগষ্ট, ১৯৭৮

দাম : ১৬ টাকা 20/-

অশোকবিকাশ ভট্টাচার্য

দাদার স্মৃতির উদ্দেশ্যে

আমাদের প্রকাশিত অরূপরতন ভট্টাচার্য-এর বই :

সেকালে এদেশে বিজ্ঞানচর্চা
বিজ্ঞানীর নোটবুক
অঙ্ক নিয়ে বুদ্ধি বিচার
অন্থ পরমাণুর দেশে
বিজ্ঞানীর দপ্তর
পৃথিবীর বাইরে কি বুদ্ধিমান জীব আছে?
রম্য গণিত
বিজ্ঞান জিজ্ঞাসুর ডায়েরি
আকাশ চেনো
আমরা কেন আমাদের মত দেখতে
সংখ্যার অসংখ্য খেলা
বৈঠকী ধাঁধার খেলা
ধাঁধা নিয়ে মজার খেলা
কাঠি নিয়ে কঠিন খেলা

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বিজ্ঞানের বই :

বিজ্ঞানী প্রসঙ্গ ॥ সুধাংশু পাত্র
বিজ্ঞানী চরিতকথা ॥ "
বিশ্বের বিজ্ঞানী ॥ অমরনাথ রায়
পৃথিবী কী করে বাঁচলো ॥ স্তানিসোয়াভ লেম
অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত ॥ (বি বি সি লণ্ডন থেকে প্রচারিত রচনা)
সিরাজুর রহমান

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশে বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহের একটা ঢেউ লক্ষ্য করা যায়। চন্দ্র অভিযান শুধু রোমাঞ্চকর অভিযান হিসাবে নয়, বিজ্ঞান সচেতনতা নিয়ে আমরা তা লক্ষ্য করেছি। ভারত যে পরমাণু শক্তিমান হল, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা তার অর্থ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি।

কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব, যার একটা বিশেষ মূল্য আছে, সে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে আমাদের তেমনভাবে পরিচয় ঘটেনি। অথচ এ সম্পর্কে সমাজের সকল স্তরের মানুষের যথেষ্ট কৌতূহল আছে। বিজ্ঞান মানসিকতা গঠনে এর যে একটা ভূমিকা আছে, তা অস্বীকার করা চলে না।

যে কোনো উন্নতিশীল দেশের পক্ষে এই বিজ্ঞান মানসিকতা গঠন একান্ত আবশ্যক। না হলে তার অগ্রগতির ধারাটি সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে না। আমাদের দেশে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারাটি যতই বেগবতী হোক, বিজ্ঞান মানসিকতা গঠনে এতদিন পর্যন্ত তার তেমন তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি। সেই মানসিকতা গঠনের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থটি প্রণীত হল।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

আনন্দমোহন কলেজ
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মহালয়া
১৯৭৬ সাল

বিষয় সূচী

বিষয় সূচী

ডবল ডেকার বাসে দোতলায় দাঁড়াব না কেন?

সরকারি পরিবহণের কল্যাণে ডবল ডেকার বাসের দোতলায় যাঁরা ওঠেন, কণ্ডাক্টরের সতর্কবাণী শুনে তাঁরা নিশ্চয় বুঝতে পারেন যে, বাস ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যে সিঁড়ির মুখ ছেড়ে দোতলায় দাঁড়ানো কোনোক্রমেই সমীচীন নয়।

কেন নয়?

একতলা বাসের সামনে-পিছনে যে কোনো জায়গায় দাঁড়ানোর স্বাধীনতায় যদি কোনো বিধিনিষেধ না থাকে, ট্যাক্সি, মোটর গাড়ির যে কোনো কোণায় স্থির থাকায় যদি নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়, ট্রাম-ট্রেনের সর্বত্রই যদি অবাধ এবং নিশ্চিত অবস্থানের সুযোগ থাকে তাহলে ডবল ডেকার বাসের দোতলায় দাঁড়ানো কেন নিরাপত্তার প্রশ্ন তোলে?

প্রশ্ন তোলার কারণ আছে।

মাটিতে যে সব যানবাহন চলে, বাইরের সচল-অচল বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ ছাড়াও আর একটি অন্তর্মুখী উল্লেখযোগ্য শক্তি তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে। এ শক্তি হল গাড়ির নিজের গতি।

দ্রুতগামী গাড়ি যখন হঠাৎ ব্রেক কষে বা রাস্তার মোড়ে বাঁক ফেরে তখন গাড়ি বিজ্ঞানের সূত্রকে অবলম্বন করে অনেক সময়ে নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। আর এই ভারসাম্য হারানোর ফলেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে, গাড়ি উল্টোয় ও যাত্রীদের জীবন বিনষ্ট হয়।

যে গাড়ি উচ্চতায় যত ছোট, পথ চলায় তার উল্টোনোর আশঙ্কা তত কম। ট্যাক্সি একতলা বাস তাই দোতলা বাসের তুলনায় অনেক নিরাপদ।

বিজ্ঞানের উন্নতির ক্ষেত্রে স্পীড একটি উল্লেখযোগ্য মাপকাঠি। যত দিন যাচ্ছে স্পীড বাড়িয়েও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্যে গাড়ির

উচ্চতাও তত দিনে দিনে ছোট হয়ে যাচ্ছে। রেসের গাড়ি, লক্ষ্য করবার মত, সাধারণ গাড়ির চেয়ে অনেক দ্রুত চলার জন্যে উচ্চতায় সে অনেক ছোট।

কিন্তু গাড়ি উচ্চতায় কম হলে যত জোরেই চলুক, উঁচু গাড়ির তুলনায় তার উল্টোনোর আশঙ্কা কম কেন ?

কম হওয়ার কারণ আর কিছু নয়, শুধু Centre of gravity-এর বা ভার-কেন্দ্রবিন্দুর অনুকূল অবস্থান। এককভাবে গাড়ির গতির জন্যে গাড়ির ভারসাম্য সচরাচর নষ্ট হয় না। কেবল গাড়ির গতি এবং গাড়ির ভার-কেন্দ্র যুগ্মভাবে গাড়ির ভারসাম্য এবং স্থিতাবস্থা বিনষ্ট করতে পারে।

গাড়ির গতি ড্রাইভারের ইচ্ছেমত—ড্রাইভারের নিজের হাতে ; না, হাতে নয়, পায়ে। আর ভার-কেন্দ্রবিন্দুটি প্যাসেঞ্জারদের ইচ্ছেমত—যত বেশি প্যাসেঞ্জার উপরে উঠবেন ততই ভার-কেন্দ্র-বিন্দুটি উপরে উঠে আসবে আর যাত্রীরা যেদিকে সরবেন ভার-কেন্দ্র-বিন্দুটি সেইদিকেই অপসৃত হবে।

দোতলা স্টেটবাসের বেলাতেও আমরা তা লক্ষ্য করি।

স্টেটবাসের দোতলায় যত বেশি প্যাসেঞ্জার উঠবেন, ততই তার ভার-কেন্দ্র উপর দিকে উঠে আসবে। এবং দীর্ঘাকৃতি বাসটির যেদিকে প্যাসেঞ্জারেরা সমবেত হবেন ভার-কেন্দ্রবিন্দু ক্রমাগত সেইদিকেই সরতে থাকবে।

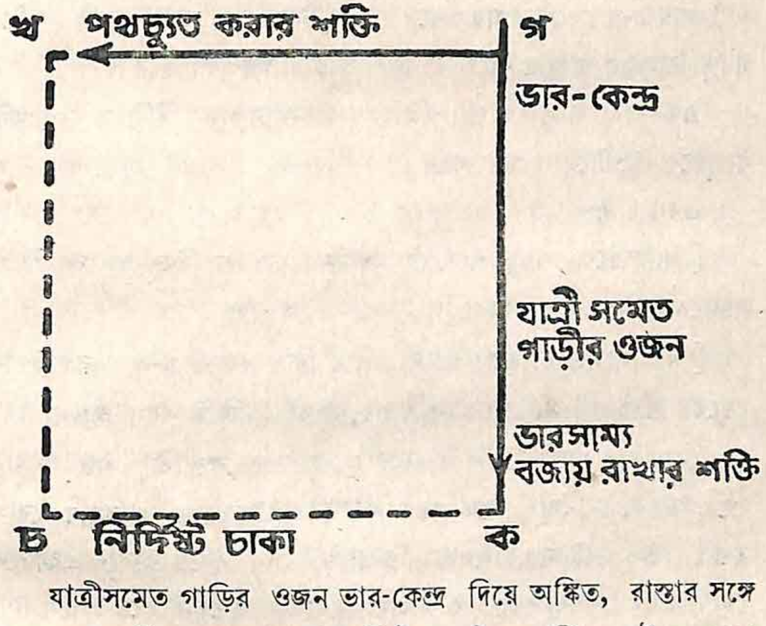
এখন কণ্ডাক্টর যাত্রীদের যে দোতলায় দাঁড়াতে নিষেধ করেন, তার কারণ ভার-কেন্দ্রবিন্দুর এই উর্ধ্বে অবস্থান রোধ করা।

যাত্রীরা দোতলায় যত বেশি সংখ্যায় উঠবেন ততই তার ভার-কেন্দ্রবিন্দু উপরে উঠে আসবে—আপাতদৃষ্টিতে এ এমন কিছু নয়। কিন্তু পথ-চলতি দ্রুত ধাবমান গাড়ির বিভিন্ন অবস্থায় এরই জন্যে নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়।

চলমান অথবা স্থির অথবা ব্রেক কষার মুহূর্তে যাত্রীসমেত যে কোনো গাড়ির ওজন গাড়িটিকে নীচের দিকে টেনে রাখে।

কী ভাবে টেনে রাখে ?

ভার-কেন্দ্র দিয়ে অঙ্কিত রাস্তার সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থিত সরল-রেখার পথে। এই আকর্ষণের মান বরাবর নির্দিষ্ট নয়। যাত্রীর সংখ্যা যত বাড়ে ততই এই টানও বাড়ে এবং এই টানই গাড়ির নিরাপত্তা বজায় রাখতে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করে। কিন্তু কেবলমাত্র এই টানই গাড়ির নিরাপত্তা সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখতে পারে না।



যাত্রীসমেত গাড়ির ওজন ভার-কেন্দ্র দিয়ে অঙ্কিত, রাস্তার সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থিত সরলরেখায় গাড়িটিকে নীচের দিকে টেনে রেখে যেমন নিরাপত্তা বজায় রাখতে সাহায্য করে, তেমনি চলন্ত গাড়ির বিভিন্ন মুহূর্তে নানাবিধ শক্তি গাড়িটিকে তার চলার পথের কখনো বামে কখনো ডাইনে পথচ্যুত করার চেষ্টা করে।

কী ভাবে চেষ্টা করে ?

না, ভার-কেন্দ্র দিয়ে অঙ্কিত রাস্তার সঙ্গে সমান্তরাল সরলরেখার পথে। গাড়ি যত জোরে চলে ততই এ শক্তির পরিমাণ বাড়ে। ফলে গাড়ি উল্টোনোর শক্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কেবলমাত্র এই টানেই গাড়ির নিরাপত্তা বিনষ্ট হয় না।

যে সূত্রের উপরে গাড়ির নিরাপত্তার অভাব ঘটা বা না ঘটা অর্থাৎ ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে সেটা বললেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে ঃ

মনে করা যাক, গ-গাড়ির ভার-কেন্দ্র।

গ-ক সরলরেখার পথে যাত্রীসমেত গাড়ির ওজন গাড়িটাকে নীচের দিকে টেনে রাখে।

আর গ-খ সরলরেখার পথে গাড়িটিকে পথচ্যুত করার শক্তি গাড়িটিকে হয় রাস্তার বাঁয়ে না হলে ডাইনে আকর্ষণ করে।

এখন ধরা যাক, কোনো এক মুহূর্তে চ-চাকার ভিত্তিতে গাড়িটি বাঁ-দিকে উল্টোনোর চেষ্টা করে।

তখন যদি,

[গাড়িটিকে পথচ্যুত করার শক্তি এবং চ বিন্দু থেকে গ-খ সরলরেখার দূরত্বের গুণফল]

[যাত্রীসমেত গাড়ির ওজন এবং চ বিন্দু থেকে গ-ক সরলরেখার দূরত্বের গুণফল]-এর থেকে বেশি হয়, তবেই গাড়ি উল্টোয়, অন্যথা নয়।

দোতলায় যাত্রী বেশি হওয়ার জন্যে ভার-কেন্দ্রবিন্দু যত উপরে ওঠে, ততই, চ-বিন্দু থেকে খ-গ সরলরেখার দূরত্বের পরিমাণ বেশি হয়। শুধু তাই নয়, পথ চলতি গাড়ি যখন বিভিন্ন কারণে একদিকে হেলে তখন চ-বিন্দু থেকে ক-গ সরলরেখার দূরত্ব ছোট হয়ে আসে।

সুতরাং যে শক্তি গাড়িকে পথচ্যুত করে তার মান যতটা বাড়ে, তার তুলনায় যে শক্তি গাড়ির ভারসাম্য বজায় রাখে তার মান অনেকটা কমে আসে। ফলে রাস্তার অসমভাব বা যাত্রীদের একপাশে চেপে দাঁড়ানো বা বিভিন্ন কারণের জন্য গাড়ি বামে ডাইনে একটু হেললেই তার উল্টোনোর সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।

এই কারণেই কণ্ডাক্টার যাত্রীদের দোতলায় ভীড় না করবার জন্যে অনুরোধ করেন।

তাই, আশঙ্কা যখন আছে তখন কী দরকার মিছে দোতলায় ভীড় করার ?

এখন যে শীতকালে বোরো ধানের উৎপাদন হয়, তা প্রথম বর্ষায় বীজবপন ও চাষবাসের সূচনা—আমাদের এই প্রচলিত সনাতন ধারণাকে খণ্ডন করে।

ধানের ফলন এবং সে ফলনকে উন্নত করা শুধু জলের উপরে নির্ভর করে না। প্রকৃতি যদি প্রয়োজন মত জল দেন তো ভাল, না হলে বিজ্ঞানের যুগে কৃত্রিম উপায়ে জলের ঘাটতি মেটানো চলে। কিন্তু ফলনের সঙ্গে শুধু জল নয়, আছে দিনের দৈর্ঘ্যের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কথাটা অদ্ভুত শোনালেও অস্বীকার করার উপায় নেই। বছরে দুটি সময় আসে, ফেব্রুয়ারি-মার্চ এবং অক্টোবর-নভেম্বর যখন দিনের দৈর্ঘ্য ১২ ঘণ্টার কম। এই সময়কাল ধান পাকবার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। ফলে ফেব্রুয়ারি-মার্চের ফলনের জন্যে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বীজ বোনা এবং অক্টোবর-নভেম্বরে যে ধান ওঠে তার জন্যে ওই সনাতনে সিদ্ধ বর্ষা নামার সঙ্গে বীজ বপন দরকার। অবশ্য এতকাল বর্ষায় যে ধান বোনা হত তা ছিল প্রচলিত অভ্যাসে, তার সঙ্গে সময়ের সম্পর্কের কথা জানা ছিল না।

কিন্তু এই দুই সময়ে ধান বোনার মধ্যে কোনো একটি সময় কি বেশি উপযোগী? হ্যাঁ, ১২ ঘণ্টার কম সময়কালীন দিনের দৈর্ঘ্যে ধান পাকার ক্ষেত্রে, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস ধান বোনার পক্ষে অনেক অনুকূল—বর্ষারম্ভ নয়। সুফলনের জন্য যেমন চাই যথেষ্ট জল, নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের দিন, তেমনই চাই প্রচুর আলো এবং মেঘমুক্ত আকাশ, বর্ষার দিনে যা দুর্লভ। অথচ শীতের সময়ে নির্মল আকাশে রোদ, আলো অপর্যাপ্ত।

ভবিষ্যতে আমাদের জনসমষ্টিকে অন্ন জোগানোর জন্যে আমাদের শুধু বর্ষাকালীন ধান চাষ নয়, শীতকালীন ধান চাষের উপরেও ব্যাপকভাবে নির্ভর করতে হবে।

করপোরেশনের পানীয় জল—পলতায় শোধিত হয়ে এই জল আসছে টালায় এবং সেখান থেকে আমাদের গৃহ প্রাঙ্গণে। তাও সর্বত্র নয়, দূরবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে টালার জল সমভাবে পৌঁছোয় না। ফলে টালার জলের সঙ্গে কোথাও নলকূপের জল মিশ্রিত থাকে। কোথাও আবার এই জল শুধু ইতিহাস ভূগোলের বস্তু, জনসাধারণ সেখানে নলকূপের জলের উপরেই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। কলকাতার দক্ষিণে যত যাব, ততই টালার জলের আস্বাদ মিলিয়ে আসবে।

কলকাতার উত্তর-দক্ষিণে জল সরবরাহের দু রকমের ব্যবস্থার জন্যে জলের গুণাগুণও দু অঞ্চলে দু রকম। কলকাতার উত্তর অঞ্চলের লোকেরা যে জল পায় তা মোটামুটি কঠিন জল নয়। ডাল জাতীয় খাদ্যবস্তু এ ধরনের জলে সুসিদ্ধ হয় এবং সাবানেও ফেনা পাওয়া যায় যথেষ্ট।

কিন্তু যেখানে নলকূপের জলের ব্যবহার সেখানে নৈরাশ্য ; জলে কাঠিন্য বেশি হওয়ার আশঙ্কা। জলে অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম জলের এই কাঠিন্যের কারণ। বৃষ্টির জল চুঁইয়ে যাচ্ছে মাটি ভেদ করে, শোষণ করছে বিভিন্ন ধাতু এবং ধাতব পদার্থ।

বিজ্ঞানীদের অভিমত, জলের কাঠিন্য ৩০০ পি পি এমের বেশি হওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ ১০ লক্ষ ভাগে সর্বোচ্চ ভাগ ৩০০। হিসেব অনুসারে লক্ষ্য করা যায়, করপোরেশনের জলের কাঠিন্য বর্ষায় বাড়ে, শীতে কমে।

জনসংখ্যা এবং জঞ্জাল—এই দুয়ের মধ্যে একটা আনুপাতিক সম্পর্ক আছে। বর্ধিত জনসংখ্যা, সঙ্গে সঙ্গে স্তূপীকৃত জঞ্জাল। আমাদের সমাজে এর পরিবর্তন সহজ নয়। জঞ্জাল সৃষ্টির কারণ সাধারণভাবে তিন ভাগে ভাগ করা চলতে পারে। মানুষ, মানুষের গৃহপালিত জন্তু —পাখী, বিড়াল, গরু, ছাগল প্রভৃতি এবং কলকারখানা বর্জিত আবর্জনা। এর কোনটাই অবহেলা করা চলে না।

যেখানে জঞ্জাল, সেখানেই রোগ জীবাণু—জঞ্জাল রোগ জীবাণুর আকর এবং সে আকর সংক্রামক ও মারাত্মক। সে ব্যাধি যারা বহন করে নিয়ে চলে তাদের মধ্যে আছে মশা এবং মাছি। বিশেষ এক ধরনের মাছি আছে যারা ফাইলেরিয়া ছড়ায়। জঞ্জাল এদের বংশবৃদ্ধিতে অতি মাত্রায় সাহায্য করে। আর আছে ইঁদুর—জঞ্জালে চলে এদের খাদ্য আহরণ। কিন্তু শুধু খাদ্য নয়, সেই সঙ্গে রোগ জীবাণুও। তারপর সে বাহক হিসাবে কাজ করে এবং রোগ জীবাণুর বিস্তার ঘটায়। ইঁদুরবাহিত সংক্রামক রোগ প্লেগ, লেপটোস্পাইরোসিস প্রভৃতি। এ ছাড়া আছে কাক এবং অন্যান্য খেচর প্রাণী খাদ্য সংগ্রহে যাদের লক্ষ্যও জঞ্জাল। সেখানেও জীবাণু আহরণ এবং রোগের বিস্তারের যথেষ্ট আশঙ্কা।

গৃহস্থেরা গৃহকে শুচি ও বিশুদ্ধ রেখেই মনে করেন নিশ্চিন্ত এবং নিরাপদ রইলুম। কিন্তু যে জঞ্জাল অদূরেই স্তূপীকৃত হচ্ছে সেই জঞ্জাল-মধ্যস্থ বিভিন্ন রোগ জীবাণু যে নানা বাহক অবলম্বন করে আবার আমাদের গৃহে প্রবেশ করছে এ সম্পর্কে আমরা কজন সচেতন আছি? অথচ সেই সচেতনতার অভাব আমাদের রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বাড়িয়ে তোলে।

জঞ্জাল স্তূপীকৃত হবে, তা যেমন স্বাভাবিক, তার নিয়মিত অপসারণ —তাও তেমনি অভিপ্রেত। আমাদের দেশে জঞ্জাল অপসারণ বিভিন্ন পরিকল্পনাহীন ব্যবস্থার মত আজও একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য

সমস্যা। তা ছাড়া বিদেশের তুলনায় আমাদের এখানকার পরিচিত জঞ্জাল-চিত্র আকারে আয়তনেও যথেষ্ট এবং ওজনেও অবহেলাযোগ্য নয়। এর ওপর জঞ্জাল জৈব পদার্থ হলে আরও মুশকিল। আর্দ্রতায় এবং উত্তাপে তার ক্ষরণ ক্ষমতাও বেশি। নতুন গাড়ি দুদিনেই জীর্ণ হয়ে রাস্তায় জঞ্জাল বিছোতে বিছোতে চলে, দেখতে পাই। ফলে জঞ্জালের স্থানান্তর এমনিতেই যেখানে একটা সমস্যা, সেখানে এদিকটিও নিশ্চয় সেই ব্যবস্থাকে আরও বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

প্রতি বছরই শীতের অভিজ্ঞতায় একটা কথা নতুন করে অনেকেরই মনে হয়, শহরে শীত কি ক্রমাগত কমছে ? ঠিক আক্ষরিক অর্থে গত বছরের তুলনায় এ বছর নয়, কিন্তু গত কয়েক বছরের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতায় নতুন করে অনেকের মনেই একটা সংশয় দেখা দিয়েছে, বোধহয় এদিকে এখন শীত আর তেমন করে নামছে না।

সাধারণভাবে নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি এই চার মাস হল শীতের মাস। এর মধ্যে প্রান্ত দুটি মাসের কথা বাদ দিলে ডিসেম্বর-জানুয়ারি হল শীতের চূড়ান্ত রূপ।

বিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্ধে শীতের আসা-যাওয়া এবং স্থিতি—এ সম্পূর্ণ নিয়মানুসারিক। এর কোন অন্যথা নেই।

আমরা উত্তর গোলার্ধের মানুষ। ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে বিষুবরেখা অতিক্রম করে সূর্য যতই দক্ষিণ গোলার্ধে নামতে শুরু করে, ততই গ্রীষ্মের তীক্ষ্ণতা কমে এবং আবহাওয়া মধুর হয়। উত্তর গোলার্ধ থেকে সূর্যের দূরত্ব ক্রমশঃ বাড়ে। তা ছাড়া সূর্য সরাসরি মাথার উপর থাকে না। দক্ষিণ গোলার্ধে ক্রমাগত নামার জন্যে তখন সে উত্তর গোলার্ধে কিরণ দেয় তির্যক ভঙ্গীতে। সে কারণেই শীতকালে দিনের বেলায় দক্ষিণের জানালা দিয়ে আমাদের ঘরে রোদ এসে পড়ে। আমাদের দিদিমা ঠাকুমারা পিঠে রোদ আর কোলে রামায়ণ নিয়ে যে শীতের দুপুরে সুর করে পড়েন, তা ওই দক্ষিণের জানালায় বসে। তারপর মকরক্রান্তি পর্যন্ত নামবার পরে সূর্য আবার উপরে উঠতে শুরু করে এবং যখন দক্ষিণ গোলার্ধের সীমা অতিক্রম করে উত্তর গোলার্ধে এসে পৌঁছোয়, তখন থেকে আবার গ্রীষ্মের খরতপনের সরাসরি উত্তাপে আমরা ঘর্মাক্ত হই।

সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর দুটি গোলার্ধের অবস্থান সংক্রান্ত এই সম্পর্ক চিরন্তন এবং শাশ্বত। এরই ফলে শীত-গ্রীষ্মের নিয়মিত এবং বাৎসরিক

অভিযান। ফলে ঋতু নিয়ন্তা সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর সম্পার্ক যেখানে অপরিবর্তনীয়, সেখানে শীত গ্রীষ্মের বাৎসরিক আচরণের এবং সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন আশা করা সঙ্গত নয়।

তা সত্ত্বেও ইতিহাস এই কথা বলবে যে, অতীতে এমন অনেক সময়ে হয়েছে যখন কোনো বছর শীত বেশি পড়েছে, কোনো বছর শীত তেমন করে নামেনি, তা ছাড়া কখনো শীত আগে এসেছে, কখনো দেরিতে বিদায় নিয়েছে, কখনো শীতের মধ্যেই হঠাৎ দারুণ গরম পড়েছে, কখনো মেঘ করে বৃষ্টি নেমেছে, কখনো কুয়াশায় চতুর্দিক ঘন হয়ে ছেয়ে গিয়েছে—শীতকালের এই জাতীয় বৈচিত্র্যের সঙ্গে আমাদের সকলেরই অল্প বিস্তর পরিচয় রয়েছে। কিন্তু শীতকালে প্রকৃতির এই জাতীয় আচরণ বৈচিত্র্যের কারণ কী?

ঋতু নিয়ন্ত্রণ করে প্রধানত সূর্য। কিন্তু পৃথিবীর দুটি গোলার্ধের পরিপ্রেক্ষিতে তার অবস্থান এমনই সুনিয়ন্ত্রিত যে শুধুমাত্র তার জন্যে যদি ঋতুগুলি প্রভাবিত হত, তাহলে বিভিন্ন বছরের শীতকালে শীতের তারতম্য দেখা যেত না। কিন্তু সূর্য ছাড়া আর একটি শক্তি আছে, যেটির নাম 'ওয়েসটার্ন ডিস্‌টারবেন্‌স।' এই ওয়েসটার্ন ডিস্‌টারবেন্‌সের জন্যে শীতের আচরণের বিভিন্ন বৈচিত্র্য এবং বৈষম্য। এরই ফলে কখনো শীত এগিয়ে আসে, কখনো দেরিতে দেখা দেয়। কখনো শীতের তীক্ষ্ণতা বাড়ে, কখনো শীতের মাঝেই গরম হাওয়া বয়।

ওয়েসটার্ন ডিস্‌টারবেন্‌স—নিম্ন চাপযুক্ত একটি অঞ্চল। শীতের মাসগুলিতে এটি ভারতবর্ষের উত্তর চেপে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের সমস্ত নিম্নচাপযুক্ত অঞ্চলের মত ওয়েসটার্ন ডিস্‌টারবেন্‌সে বাতাসের গতি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। সুতরাং যখন একটি ওয়েসটার্ন ডিস্‌টারবেন্‌স উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ থেকে শীতকালে কলকাতার উত্তর-পশ্চিমে এসে পৌঁছোয়, তখন বঙ্গোপসাগর থেকে উষ্ণ জলীয় বাষ্প নিয়ে সে কলকাতায় উপস্থিত হয়। তার ফলে শীতের মাঝেই রাত্রির কলকাতায় অকস্মাৎ গরম পড়ে, কুয়াশা দেখা দেয় এবং বঙ্গোপসাগরের জলীয় বাষ্পের

জন্যে বৃষ্টিপাতও হয়ে থাকে। তারপর যখন এই ওয়েসটার্ন ডিস্টারবেন্স কলকাতাকে অতিক্রম করে আরও পূর্ব দিকে বয়ে চলে, তখন তার ঘড়ির কাঁটার বিপরীত অভিমুখীন গতির জন্যে এবার হিমালয় থেকে সংগৃহীত বাতাস কলকাতার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়—তখন আবার মাত্রাতিরিক্ত শীত পড়ে। ওয়েসটার্ন ডিস্টারবেন্সের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক। ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ। ৯ তারিখে রাত্রে সর্বনিম্ন তাপ ছিল ১৬·৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। ১০ তারিখে সেটি বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল ২২·৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। এটি হল বঙ্গোপসাগরের উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পের জন্যে। তারপর হিমালয়ের শৈত্যের জন্যে তাপমাত্রা অকস্মাৎ কমে ১১ তারিখে দাঁড়ায় ১৩·৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং ১২ তারিখে ৭·২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

শীতকালে প্রতি মাসে ওয়েসটার্ন ডিস্টারবেন্সের সংখ্যা তিন থেকে পাঁচ। পাঞ্জাব থেকে আসাম পর্যন্ত আসতে সময় লাগে প্রায় ৬ দিন।

শীতের আচার-আচরণের যতরকম হেরফের আমরা লক্ষ্য করি, তার সব এই ওয়েসটার্ন ডিস্টারবেন্সের জন্যে। নিয়মানুসারিক বা শৃঙ্খলাযুক্ত নয় বলে তা দিয়ে বিভিন্ন বছরের শীতের মাত্রাকে ধারাবাহিক ওঠা বা নামার পর্যায়ে সাজানো যায় না। টেম্পারেচার চার্টও জোরালো ভাষায় সেরকম কথা বলে না।

এ কথা ঠিক যে দ্রুত গড়ে ওঠা শহর, উঁচু বাড়ি, ঘন বসতি, কলকারখানা, চলমান জীবন, অবলুপ্ত গাছ, উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে শীতের প্রভাব কিছুটা কমে, তার সঙ্গে সন্ধের ফুটপাথে স্বল্পবাস-ছেলে-মেয়েদের স্বচ্ছন্দ চলাফেরা শীতের প্রকোপ সম্বন্ধে আমাদের সংশয়ান্বিত করে তোলে, কিন্তু শহরের মধ্যস্থলের তাপমাত্রার সঙ্গে শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত আবহাওয়া অফিসের তাপমাত্রার পার্থক্য নির্ণয় করবার কোনো উপায় নেই।

ভারতবর্ষের বাইরে বিদেশে কিন্তু 'সিটি ক্লাইমেট' নির্ণয় করবার

জন্যে মূল শহরের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি আবহাওয়া কেন্দ্র আছে। লক্ষ্য করা গেছে, মূল শহরের সঙ্গে শহরের বাইরের অঞ্চলের তাপমাত্রার পার্থক্য ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মত।

কলকাতা সমেত আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে সরাসরি সিটি ক্লাইমেট নির্ণয়ের জন্যে এই জাতীয় কেন্দ্র স্থাপনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। কেবল তখনই এই কথা সঠিকভাবে বলা সম্ভব যে, দ্রুত গড়ে ওঠা শহরের জন্য কলকাতার শীত কতটা কমছে।

জীবদেহে জীবনের ভাষারই অবিকল মুদ্রণ চলে কোষ বিভাজন এবং কোষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। আদিতে একটিমাত্র কোষ, তারপরে সেই একটি কোষ থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি, চারটি থেকে আটটি এইভাবে কোষের যে দ্বিত্বকরণ দেখি নিয়ম ধরে—সেখানে বিচ্যুতির আশঙ্কা কম। কিন্তু পাকা টাইপিস্টও কপির কাজে যেমন কখনো কখনো ভুল করে, তেমনি এখানেও মাঝে মাঝে মুদ্রণ প্রমাদ ঘটে থাকে। ফলে জীবনের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকত্ব ফুটে ওঠে। এই মুদ্রণ প্রমাদ যেখানে আকস্মিক, সেখানে করণীয় কিছু নেই, কিন্তু যেখানে তা পারিপার্শ্বিক অবস্থানির্ভর, সেখানে আমাদের চিন্তার অবকাশ আছে। আমরা অনেকেই জানি না যে, এই এক্স-রে জনিত বিকিরণের সঙ্গে মুদ্রণ প্রমাদের একটা উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক রয়েছে!

বিকিরণের ফল আসতে পারে গর্ভাবস্থার প্রাথমিক পর্যায় থেকেই। ফলে বাবা-মা উভয়েই যেখানে 'জেনেটিক' দিক দিয়ে সুস্থ, অর্থাৎ বংশগত বা জন্মগত অস্বাভাবিকত্ব কারো মধ্যেই যেখানে কোনোভাবে নেই সেখানে একটি সুস্থ সন্তানের আকাঙ্ক্ষা অনভিপ্রেত কিছু নয়। কিন্তু গর্ভবতী মায়ের একাধিক বার এক্স-রে নেওয়া, অস্বাভাবিকত্ব এবং বিকৃতি নিয়ে আসতে পারে নবজাতকের মধ্যে।

জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে মুদ্রণ প্রমাদের আশঙ্কায় প্রয়োজনের মুহূর্তে এক্স-রেকে অগ্রাহ্য করব কি করে? কিন্তু যে শিশুটি আসছে তার কথা ভেবে যদি ওই কটা দিনের জন্যে একটু সতর্ক হওয়া যায় তো, দুশ্চিন্তা নিশ্চয় কিছুটা কমে।

একটা কথা অস্বীকার করবার নয় যে, সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে বাংলাদেশেই বেশি। ১৯৭০ সালে নভেম্বর মাসে যে প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের তটভূমিকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তা আমরা এখনও ভুলিনি। ইতিহাসের পাতা একবার উল্টোলে দেখা যাবে যে, প্রবল ঘূর্ণিঝড় বহুবার মেঘনার ব-দ্বীপ অঞ্চলে আঘাত করেছে। প্রায় একশো বছর আগে একবার বাখরগঞ্জ অঞ্চলে চোখ ফেরালে দেখতে পাব, মারাত্মক এক ঘূর্ণিঝড়ে সেখানে প্রচুর লোকক্ষয় হয় এবং সেই সঙ্গে ধনসম্পত্তিও। ভারতে আবহাওয়া বিভাগ স্থাপিত হয় বাখরগঞ্জে এই ঘূর্ণিঝড়ের পরেই।

স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন আসে, বাংলাদেশের প্রতি ঘূর্ণিঝড়ের এ পক্ষপাতিত্ব কেন ?



এটা বুঝতে হলে কিসে ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত হয়, সেটা আগে জানা দরকার। ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে সমুদ্রপৃষ্ঠে বায়ুর চাপ

অস্বাভাবিক রকম কম, কিন্তু সেই একই জায়গায় ১০।১২ কিলো-মিটার উপরে বায়ুর বিপরীত চিত্র, সেখানে বায়ুর উচ্চ চাপক্ষেত্র নজরে আসে। উর্ধ্বাকাশে এই স্তরের বায়ুরাশিকে যদি লক্ষ্য করা যেত তাহলে নজরে আসত ঘড়ির কাঁটা যে দিকে ঘোরে, সে ঘুরে চলেছে সেইদিকে। তার পথ প্যারাবোলিক (Parabolic)। বঙ্গোপসাগরের জলে জিহ্বা প্রসারিত করে পশ্চিমমুখী দাঁড়ানো যাক। জিহ্বার প্রান্ত দিয়ে এক দিক থেকে অন্য দিক পর্যন্ত যে ধারাবাহিক পথ তাই প্রায় প্যারাবোলিক পথ এবং ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে বাঁ দিক থেকে ডান দিক ঘড়ির কাঁটার অভিমুখীন গতিযুক্ত। ফলে যে ঘূর্ণিঝড় বঙ্গোপসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের কাছে আজ আছে সেটি আগামীকাল কিছুটা উত্তর-পশ্চিম দিকে যাবে, তারপর এটি উত্তরমুখী হয়ে এগোবে এবং শেষে উত্তর-পূর্বাভিমুখী হয়ে অগ্রসর হয়ে বাংলাদেশের তটে আঘাত করবে। ঝড়ের গতিপথ তাকে বাংলাদেশের দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ মনে হয়।

নদ-নদীতেও ঘূর্ণিঝড়ের প্রবল আকর্ষণ। বর্ষাকালে পূর্ববঙ্গের নিম্নভূমি বেশির ভাগই জলের তলায় থাকে। বর্ষার জলে ফুলে ফেঁপে বাংলাদেশের নদীগুলিও বিপুলকায় হয়। ঘূর্ণিঝড়ের যা কিছু শক্তি তা আসছে জলের লীন তাপ থেকে। জলীয় বাষ্প প্রবাহ যেই বন্ধ, অমনি ঘূর্ণিঝড়ও দুর্বল। স্থলভাগে দ্রুত সে প্রতাপ হারায়। তাই নদীর অববাহিকা অঞ্চল দিয়ে ঘূর্ণিঝড় অভ্যন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করে। বাংলাদেশের যত ঘূর্ণিঝড় তার সাধারণ প্রবেশ পথ মেঘনার অববাহিকা অঞ্চল।

কোন্ উষ্ণ প্রস্রবণ কতটা উত্তপ্ত ?

আমাদের মাথার উপরে শক্তির আধার যেমন সূর্য, তেমনি পায়ের নীচে পৃথিবী। যতই গভীরে নামা যায় ততই গভীরতর উত্তাপ। এবং পারিপার্শ্বিক যেমন জীবনকে প্রভাবিত করে, তেমনি সে উত্তাপের কিছুটা পরিচয় বহন করে আমাদের দেশের উষ্ণ প্রস্রবণগুলি।

আমাদের দেশে বিভিন্ন দিকেই অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ ছড়িয়ে আছে। সাধারণভাবে উষ্ণ প্রস্রবণগুলি লক্ষ্য করা যায় বিহারে এবং মহারাষ্ট্রে। হিমালয় অঞ্চলেও কিছু কিছু আছে। এ ছাড়া আসামে, ওড়িশায়, সিকিমে, দক্ষিণ-ভারতে, মধ্য-প্রদেশে এবং পশ্চিম বাংলাতেও উষ্ণ প্রস্রবণের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে। বেশি দূরে নয়, মাত্র কয়েক পা এগোলেই বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবণ। তার উত্তাপের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মাত্রা ৬৭ ডিগরি সেনটিগ্রেড এবং ৪২ ডিগরি সেনটিগ্রেড। রাজগীরের প্রস্রবণ বক্রেশ্বরের মত উত্তপ্ত নয়। সেখানকার উত্তাপ গড়ে ৪২ ডিগরি সেনটিগ্রেড। হাজারিবাগে যে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তার উত্তাপ রাজগীর বা বক্রেশ্বরের অনেক উপরে—৮৫ থেকে ৮৭ ডিগরি সেনটিগ্রেড। কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য উষ্ণ প্রস্রবণ হিমাচল প্রদেশের কুলু জেলার মণিকরনে। সেখানকার সর্বোচ্চ উত্তাপ ৯৮ ডিগরি এবং সর্বনিম্ন ৬৪ ডিগরি সেনটিগ্রেড।

আমাদের ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে যত উষ্ণ প্রস্রবণের পরিচয়, সাধারণভাবে তার কোনটিরই জলধারার উত্তাপ ১০০ ডিগরি সেনটিগ্রেড পর্যন্ত আসে না। অথচ ভূ-পৃষ্ঠের অন্তরালে উত্তাপ তুলনায় অনেক বেশি। যদি বাইরের উত্তাপ বাষ্পীকরণের উপযুক্ত হত, তা হলে তার ব্যবহারিক উপযোগিতা থাকত অসাধারণ।

এদেশে উষ্ণ প্রস্রবণগুলি নিয়ে গবেষণা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। অথচ সম্ভাবনা সেখানে বিপুল। শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকটা নিয়ে নয়, প্রস্রবণগুলিতে ধাতব পদার্থ, গ্যাসীয় পদার্থের পরিমাণ কত, সেগুলির প্রাপ্তি সম্ভাবনা কি রকম, রোগ নিরাময়ে এই সব

জলধারার কার্যকারিতা কতদূর—গবেষকদের মঙ্গলহস্তে এই সব সম্ভাবনার বীজ একটা সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করুক। আমাদের পশ্চিমবাংলার বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবণ নিয়ে গবেষণা কিছু কিছু হয়েছে এবং সে গবেষণার ফলও আশাপ্রদ। রোগ নিরাময় সংক্রান্ত বিভিন্ন গুণ সে জলে আছে, চর্মরোগে তার উপকারিতা দেখা যায়, পরিপাকে সে সহায়তা করে, বাত জাতীয় রোগেও সে জল সুফল প্রদান করে, তা ছাড়া ওতে রেডিও-অ্যাকটিভ হিলিয়ামেরও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এ গবেষণার ফল ব্যবহারোপযোগী করে তোলা হয়নি। ফলে এগুলি এখনও কেবল তীর্থযাত্রী এবং ভ্রমণ বিলাসীদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

টেলিফোনে রং নামবার—টেলিফোন গ্রহীতাদের প্রাত্যহিক জীবনের বিরক্তিকর এবং মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা।

হ্যালো, এটা কি ৯৬৭৫৯৬ ?

না, না, রং নামবার।

রং নামবার ! কণ্ঠে বিস্ময়।

কিন্তু ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়। ফলে সঙ্কুচিতচিত্তে টেলিফোন নামিয়ে রেখে পরে সতর্ক হয়ে ডায়াল করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই।

কিন্তু ভুল হওয়ার একটা মাত্রা আছে। ৭৫৯৬ এর বদলে ৮৫৯৬ হোক, তার একটা মানে বুঝি—সাতের জায়গায় আট, পাশাপাশি দুটি অঙ্ক, ফলে যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যে ভুল হলেও মন ভাববে অসতর্কতায়, ডায়ালের নির্দিষ্ট ঘরের বদলে পরবর্তী ঘরে আঙ্ুল বসেছে—তাই পরিচিত কণ্ঠস্বরের পরিবর্তে অনভিপ্রেত সম্ভাষণ,—"কে বলছেন"-এর বদলে "কৌন হ্যায় ?"

এ রকম অনেক সময়ে হয়েছে, ভবিষ্যতেও হবে।

কিন্তু যেখানে রং নামবার উদ্দিষ্ট নামবারের পারস্পরিক সংখ্যার থেকে অনেক তফাত যা আঙ্ুলের অসতর্কতায় কিছুতেই আসতে পারে না, সেখানেই হয় সংশয়, আর সেই সংশয় তখন রং নামবারের সমস্ত ক্ষেত্রেই ছড়িয়ে পড়ে।

রং নামবার কেন হয় ?

তার উত্তরে শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে অটো-এক্সচেন্‌জে কীভাবে যোগাযোগ স্থাপিত হয়—সেই কথা বলি।

এ অনেকটা উঁচু বাড়ির কোনো একটা ফ্ল্যাটে পৌঁছনোর মত। একটা দশ তলা বাড়ি কল্পনা করা যাক—প্রতি তলায় দশটা করে ফ্ল্যাট, এক থেকে দশ নম্বর এক তলায় বাঁ থেকে ডাইনে, পাশাপাশি সাজানো। এই হিসেবে যদি ৭৩ নম্বর ফ্ল্যাটে পৌঁছতে চান তো

আগে নিঃসন্দেহে আপনাকে আট তলায় উঠতে হবে, তারপর ডান দিক চেপে তিন নম্বর ফ্ল্যাট পর্যন্ত সরতে হবে। এ ছাড়া আর পন্থা নেই। যদি আমাদের অটো-এক্সচেন্‌জে শুধু দু অঙ্কের নামবার থাকত, ৯৯ পর্যন্ত, তাহলে ঠিক এই পদ্ধতিতে যোগাযোগ রক্ষিত হত—কিন্তু কলকাতা শহর, সেখানে কয়েক লক্ষ টেলিফোন গ্রাহক, অনেকগুলি এক্সচেন্‌জেই প্রায় দশ হাজার টেলিফোন আর তাই প্রতি টেলিফোনেরই ছয় অঙ্কের সংখ্যা।

সেই জন্যে দুই অঙ্কের নামবার যতটা সহজে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে রং নামবার এড়িয়ে চলে, ছয় অঙ্কের নামবার ততটা নয়।

পদ্ধতি একই, কিন্তু ছয় অঙ্কের নামবারের বেলায় নির্দিষ্ট সংখ্যা ক্রমে ক্রমে এবং অনেকগুলি স্তরে সম্পূর্ণতা পায়।

ধরা যাক, নির্দিষ্ট সংখ্যা ৯৮১২৩৪।

এর প্রথম অঙ্ক ৯ ডায়াল করা হল।

সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শুরু। প্রথম স্তরে বৈদ্যুতিক ঘাতের সাহায্যে লিফটের উপর নীচ গতির মত প্রথম সংখ্যা-নির্বাচক (সিলেক্টর) ৯ ধাপ উন্নীত হল। প্রথম সংখ্যা-নির্বাচকটির পাশাপাশি আরও কয়েকটি সংখ্যা-নির্বাচক আছে। পরবর্তী সংখ্যাগুলি নির্দিষ্টকরণই তাদের কাজ। দ্বিতীয় সংখ্যার জন্যে দ্বিতীয় সংখ্যা-নির্বাচক। তার কাজ একই—শুধু প্রথম সংখ্যার বদলে সে ছয় অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্ক নির্বাচন করে। এইভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যার জন্যে তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা-নির্বাচক। বাকি থাকে দুটি সংখ্যা, সে দুটি এককের এবং দশকের ঘরের। এই দুটি সংখ্যার জন্যে আরও দুটি সংখ্যা-নির্বাচকের প্রয়োজন হয় না। একটি নির্বাচকের সাহায্যেই তাদের নির্দিষ্ট করা চলে।

সংখ্যাগুলি স্তরে স্তরে নির্বাচিত হবার সময়ে যান্ত্রিক গোলযোগে অনেক ক্ষেত্রে রং নামবারের অনুপ্রবেশ হয়। ৬ ডায়াল করা হল, সংখ্যা নির্বাচক ৬ ঘর উন্নীত হবে এই স্বাভাবিক, কিন্তু গতির আতিশয্যে তা কখনো বা আরও এক ঘর বেশি উন্নীত হয়ে রং নামবার

ঘটায়। তা ছাড়া অন্য রকম যান্ত্রিক ত্রুটিও রং নামবারের উল্লেখযোগ্য কারণ। ডায়ালের পরে যে বৈদ্যুতিক ঘাত সঞ্চালিত হয়, সেই বৈদ্যুতিক ঘাতের সংখ্যা ডায়ালিংয়ের নির্দিষ্ট ঘাতের সঙ্গে সমান। ডায়াল যদি স্বাভাবিকভাবে কাজ না করে তা হলে বৈদ্যুতিক ঘাতের সংখ্যার পরিবর্তন ঘটে আর পরিবর্তন মানেই রং নামবার।

ঠিকভাবে ডায়াল করার উপরেও রং নামবার হওয়া না হওয়া অনেক সময়ে নির্ভর করে। ছয় অঙ্কের একটি সংখ্যা নিয়ে যখন প্রতিটি অঙ্ক ডায়াল করি, সে সময়ে মনে রাখা দরকার যে, এক একটি সংখ্যাকে ডায়াল করে, আঙুল তুলে নিয়ে ডায়ালের চাকতিকে যখন স্বাভাবিক গতিতে স্বস্থানে ফিরে আসবার সুযোগ দিই, বৈদ্যুতিক ঘাতগুলি সৃষ্টি হয় তখনই। ফলে কেউ যদি আঙুল না তুলে ডায়ালের চাকতিকে স্বস্থানে ফিরে আসা পর্যন্ত আঙুল বসিয়ে রাখেন, তা হলে ডায়ালের গতি ব্যাহত হতে পারে আর গতি ব্যাহত হওয়া মানেই বৈদ্যুতিক ঘাতের সংখ্যার পরিবর্তন এবং পূর্বের মতন আবার রং নামবারের আশঙ্কা।

রং নামবার বিজ্ঞানোন্নত এ যুগের টেলিফোন ব্যবস্থার সবচেয়ে লজ্জার কথা। ব্যক্তিগত অসতর্কতায় যেখানে রং নামবার হয় সেখানে করণীয় কিছুই নেই। কিন্তু ত্রুটি যেখানে যান্ত্রিক সেখানে রং নামবারের হাত থেকে নিষ্কৃতি সকলেই আশা করতে পারে।

গ্রীষ্ম এবং জলকষ্টের সঙ্গে সঙ্গে কলেরার প্রাদুর্ভাবের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। রোগটি প্রাচীন, এ সম্পর্কে নতুন করে বলবার কিছু নেই। কিন্তু মজার কথা সাম্প্রতিক কালে রোগটির জীবাণুর বিবর্তন ঘটেছে। রোগটির লক্ষণ এক, দুই ক্ষেত্রেই ; চিকিৎসাপদ্ধতিরও হেরফের কিছু নেই, কিন্তু হলে কি হবে, দুটি জীবাণুর মধ্যেই মৌলিক পার্থক্য নজরে আসে।

কলেরার যে জীবাণু এখন দেখা যায় তার নাম Eltor। এর জীবাণুর আধিপত্যের কথা জানা ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, আমাদের এদিকে নয়। তারপর বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী রাজার মতন এর আক্রমণ এবং আমাদের দেশে এখন এর বিস্তার ঘটেছে। ১৯৬৪ সালে ঢাকা শহরে এবং প্রায় সেই সঙ্গে কলকাতাতেও।

বর্তমানে কলেরা রোগের আক্রমণের জন্যে যে জীবাণু প্রায় সর্বত্রই দায়ী তা এই Eltor। অথচ ১৯৬৪ এর পূর্বে classical vibrio এর ছিল একাধিপত্য। এখনও যে classical vibrio দেখা যায় না, তা নয়, তবে তা খুব অল্প।

হৃদ্‌যন্ত্রের কার্যক্ষমতার সঙ্গে কি চায়ের অনুকূল বা প্রতিকূল কোনো সম্পর্ক আছে ?

এ কথা ঠিক যে, দিনের শুরুতে শরীরকে সক্রিয় করে তোলায় বা দিনের শেষে শারীরিক ক্লান্তি অপনোদনের জন্যে সামান্য এক কাপ চা অনেকটা কাজ করে। বর্তমানে চায়ের প্রচলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু দেখা দরকার, সে বৃদ্ধি আমাদের হৃদ্‌যন্ত্রের উপরে কিরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।

চা সম্পর্কে যেমন অনুকূল মতামত আছে, তেমনি বিরূপ মন্তব্যও শোনা যায় বৈজ্ঞানিক মহলে। চায়ের যাঁরা সমালোচনা করেন তাঁদের অভিমত এই যে, চা-পানে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়, ক্ষুধারও উদ্রেক হয় না। কিন্তু এ নিতান্তই সামান্য কথা, চা-পান সম্পর্কে যাঁরা অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাঁরা যা বলেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁদের বক্তব্য, চা-পান অনিষ্টকারক তো নয়ই বরঞ্চ এর উপকারিতাও আছে। মানবদেহকে হৃদ্‌যন্ত্রের আক্রমণ থেকে চা নিয়ত রক্ষা করে।

হৃদ্‌যন্ত্রের আক্রমণ কেন ঘটে ?

রক্ত চলাচলের ক্ষেত্রে করোনারি ধমনী কখনো কখনো রুদ্ধ হয়ে যায়। রুদ্ধ হওয়ার কারণ হিসেবে মূলত যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়, তা হল Cholesterol। এই কোলেস্টেরল ধমনীর গাত্রে সঞ্চিত হয়ে রক্ত চলাচলের পথকে ক্রমশ এমনভাবে সঙ্কীর্ণ করে তোলে যে, স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। মাত্রা বৃদ্ধি পেলে রক্ত চলাচল বন্ধ পর্যন্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায় এবং পরিণতিতে হৃদ্‌যন্ত্র দারুণভাবে আক্রান্ত হওয়াও অসম্ভব নয়।

খাদ্যে বেশি চর্বি গ্রহণ কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। বিভিন্ন দেশের গবেষকরা বিষয়টি নিয়ে অনেকদিন গবেষণা করেছেন এবং সম্প্রতি লক্ষ্য করেছেন যে, দেহাভ্যন্তরে ধমনীগাত্রে চা এই চর্বি

ধরনের পদার্থটিকে নিয়ন্ত্রিত রাখে এবং হৃদ্‌যন্ত্রের আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করে। ফলে চা হৃদ্‌যন্ত্রের আক্রমণ থেকে দেহকে মুক্ত রাখে এমন অভিমত যে সব গবেষক পোষণ করেন তাঁরা সবাইকে চর্বিমুক্ত খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে এক কাপ চা পান করবার কথা বলেছেন।

কিন্তু চায়ের বেলায় রক্তে চর্বি নিয়ন্ত্রণে যে প্রতিক্রিয়া পানীয় হিসেবে কফির বেলায় তার বিপরীত ফল। চা রক্তে যে চর্বির পরিমাণ কমিয়ে আনে, কফি তা বাড়িয়ে তোলে। ফলে অনুকূল পরিবেশে চায়ের তুলনায় কফি পানে হৃদ্‌যন্ত্রের আক্রমণ হওয়ার আশঙ্কা বেশি বলেই এক শ্রেণীর গবেষকেরা মনে করছেন।

ওজনের ফাঁকি আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা, আমাদের নিত্য প্রবঞ্চনা করে।

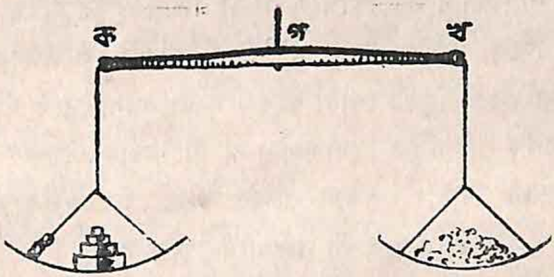
দাঁড়ি-পাল্লার সাহায্যে যে ওজন, সে জাতীয় ওজনের কথা বলছি। বাজারে এ ধরনের ওজনের ক্ষেত্রে ঠকানোর বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কম ওজনের বাটখারা ব্যবহার, পাষাণে হেরফের রাখা, তা ছাড়া পায়ের ঠেলায় বা হাতের আঙ্গুলের চাপে ওজনের সমতা আনা, কিম্বা ঝাঁকুনিতে ঝুঁকিয়ে দেওয়া—কেনাবেচায় ফাঁকি দেওয়ার বা লোক ঠকানোর এ জাতীয় বিভিন্ন পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য ও সর্বজনবিদিত।

কিন্তু দাঁড়ি-পাল্লায় প্রবঞ্চনার এ জাতীয় পদ্ধতিগুলির মধ্যে কোনো কৌলীন্য নেই। পদ্ধতিগুলি স্থূল এবং সাময়িক। ফলে এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়েই বিক্রেতার ধরা পড়বার কম-বেশি আশঙ্কা থাকে এবং ক্রেতা একটু সতর্ক হলেই এ জাতীয় অপকৌশলের ফাঁদ এড়িয়ে নিষ্কৃতি লাভও করতে পারেন।

এসব ত্রুটি-বিচ্যুতির উর্ধ্বে ফাঁকি দেওয়ার একটি স্বতন্ত্র ও উন্নত পদ্ধতি আছে। শুধু স্বতন্ত্র বা উন্নত নয়, পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে বিস্ময়করও। বিক্রেতারা ক্রেতাদের এই পদ্ধতিটির সাহায্যে অনায়াসে প্রতারিত করবার শক্তি রাখেন। সঠিক বাটখারা ব্যবহার করে, পাষাণ ঠিক রেখে, পায়ের ঠেলা বা আঙ্গুলের চাপ কাজে না লাগিয়ে কীভাবে ক্রেতাকে ঠকানো যেতে পারে তার এক অভিনব ও চিত্তা-কর্ষক পদ্ধতি এটি। স্টেজের ম্যাজিকের মতই রোমাঞ্চকর। আমার মনে হয়, যাঁরা অভিজাত জালিয়াত, তাঁরা এই পদ্ধতিই ব্যবহার করেন। পদ্ধতিটি স্থায়ী, ধরা ছোঁয়ার বাইরে, এবং সম্পূর্ণভাবে গাণিতিক চিন্তার উপরে নির্ভর করে।

বাজারে ব্যবহৃত যে কোনো দাঁড়ি-পাল্লার চেহারাটা একবার কল্পনা করা যাক। কাঠের বা লোহার দাঁড়ি। মাথায় লোহার কাঁটা,

দড়ি বা লোহার রিংয়ের সাহায্যে দুদিকে দুটি ঝোলানো পাল্লা। এই দাঁড়ি-পাল্লার যেখানে সমতানির্দেশক কাঁটাটি রয়েছে সেটি কেন্দ্রবিন্দু বা Fulcrum। গ-নামে এটিকে অভিহিত করি। দাঁড়ি-পাল্লার যে দুটি প্রান্তবিন্দু থেকে পাল্লাযুক্ত দড়ি ঝোলানো হয়, সে দুটিকে ক ও খ নামে নির্দিষ্ট করছি। এখন নির্দোষ দাঁড়ি-পাল্লার ক্ষেত্রে গ বিন্দুটি দুটি প্রান্ত বিন্দু ক ও খ থেকে সমান দূরে অবস্থান করে। অর্থাৎ গ বিন্দু ক ও খ-এর মধ্যবিন্দু রূপে পরিগণিত হয়।



এই গ বিন্দু যদি ক ও খ থেকে সমদূরে অবস্থিত না থাকে—তখন কী হবে? তখনই ওজনের পার্থক্য নজরে আসবে। বিষয়টি ভালো করে বুঝিয়ে বলা যাক।

ধরা যাক, সম্পূর্ণ দাঁড়ির দৈর্ঘ্য ৬০ সেন্টিমিটার। নির্দোষ দাঁড়ি-পাল্লার বেলায় গ, কখ-এর মাঝে অর্থাৎ গক ও গখ এর দৈর্ঘ্য ৩০ সে. মি. করে হওয়া উচিত। কিন্তু ঠকানোর মতলব নিয়ে যাঁরা বসেন তাঁদের দাঁড়ির প্রান্তবিন্দুদ্বয় (খেয়াল রাখতে হবে, প্রান্ত বিন্দুদ্বয় বলতে আমরা যে দুটি বিন্দু বলছি, সে দুটি বিন্দু থেকে পাল্লাযুক্ত দুটি দড়ি দুদিকে ঝোলানো হয়) ক ও খ, গ বিন্দু থেকে সমান দূরে থাকে না। যে দিকে বাটখারা চাপানো থাকে (ধরুন ক বিন্দুর দিকে), সেদিকের দৈর্ঘ্য ঈষৎ কম করা থাকে। ৬০ সে. মি. দাঁড়িপাল্লার ক্ষেত্রে ধরা যাক ২৯$\frac{৩}{৪}$ সে. মি. আর ৩০$\frac{১}{৪}$ সে. মি.। খুব বেশি পার্থক্য করা আবার নিরাপদ নয়। তাতে ক্রেতার নজরে আসতে পারে!

এখন মনে হতে পারে যে, এইরকম দাঁড়িপাল্লায় দুটো পাল্লা খালি করে পাষাণ ঠিক আছে কিনা ক্রেতাকে দেখানোর সময়ে দাঁড়ি-পাল্লার কাঁটাটি পাল্লার সঙ্গে লম্বভাবে না থেকে ঈষৎ হেলে থাকে। সেটাই স্বাভাবিক। দাঁড়ির যে দিকের দৈর্ঘ্য একটু ছোট (ক গ) দাঁড়ির সেদিকের অংশ ভূমির সমান্তরাল না থেকে উপর দিকে একটু উঠে থাকার কথা। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়ি-পাল্লার সমতা নির্দেশক কাঁটাটিরও অন্য প্রান্তের দিকে ঝুলে থাকা সংগত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেরকম দেখা যায় না! গাণিতিক কৌশলে সমতা রক্ষার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। কেন্দ্রবিন্দু থেকে দাঁড়ি-পাল্লার যে দিকের অংশটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র (ক গ) সেদিকের দড়িতে গোটা কয়েক ফুটো পয়সা বেঁধে সমতা রক্ষা করলেই সার্থক পরিণতি! দোকানীর বা বিক্রেতার এইটুকুই করণীয়। শূন্য দাঁড়িপাল্লা নির্দোষ, সমতা রক্ষিত হচ্ছে, অথচ ওজনের সময় ঠকতে হয়। কীভাবে এবং কী পরিমাণে ঠকতে হয়?

৬০ সে. মি. দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট দাঁড়ি-পাল্লার ক্ষেত্রে যেদিকে বাটখারা চাপানো হয় সেদিকের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ ক গ ২৯$\frac{৩}{৪}$ সে. মি. ধরেছি। গ খ ৩০$\frac{১}{৪}$ সে. মি.। এখন এ জাতীয় পাল্লায় কিনবার সময়ে মনে রাখতে হবে যে, এক্ষেত্রে যে ওজনের বাটখারা ব্যবহার করা হয়, সেই ওজনের জিনিস পাওয়া কোনদিনই সম্ভব নয়। প্রাপ্য জিনিস কেবল বাটখারার ওজনের ওপরে নয়, কেন্দ্রবিন্দু থেকে প্রান্ত বিন্দুদ্বয়ের দূরত্বের উপরেও আংশিকভাবে নির্ভর করে।

এখানে বলি যে, দুটি পাল্লার সমতা রক্ষা একটি সূত্রের উপরে নির্ভরশীল—সূত্রটি এই ; (ক গ) × বা =(খ গ) × ব ;

ক গ = কেন্দ্রবিন্দু থেকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রান্তবিন্দুর দৈর্ঘ্য

বা = সেই প্রান্তস্থ বাটখারার ওজন

খ গ = কেন্দ্রবিন্দু থেকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ প্রান্তবিন্দুর দৈর্ঘ্য

ব = ওই প্রান্তস্থ বস্তুর ওজন

পূর্বে বলেছি, কেন্দ্রবিন্দু থেকে দাঁড়ির যে দিকের দৈর্ঘ্য ছোট সেদিকে বাটখারা চাপানো হয়। তা হ'লে ৬০ সে. মি. দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট

দাঁড়ি-পাল্লার ক্ষেত্রে বাটখারা চাপানো হবে ২৯$\frac{৩}{৪}$ সে. মি. অর্থাৎ ১১৯/৪ সে.মি.-এর দিকের পাল্লায়। ধরা যাক, এক কিলোগ্রাম ওজনের বাটখাড়া চাপানো হল। মনে হবে ওজনে সমতা রক্ষা হলে এক কিলোগ্রাম ওজনেরই জিনিস পাওয়া যাবে। আসলে কিন্তু তা নয়। যতটা পাওয়া যাবে সূত্রের সাহায্যে সেটা হিসাব করি।

$\frac{১১৯}{৪}$ সে. মি. × ১০০০ গ্রাম = $\frac{১২১}{৪}$ সে. মি. × জিনিসের ওজন

সুতরাং জিনিসের ওজন যা পাওয়া যায়, তা প্রায় ৯৮৩ গ্রামের মত। ১০০০ গ্রামে ১৭ গ্রাম কম। দাঁড়ির দৈর্ঘ্যের হেরফের করে ওজনে আরও অনেক বেশি বৈষম্য আনা চলে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মজা এই যে, শূন্য দাঁড়িপাল্লায় সমতা রক্ষা হয়, অথচ প্রতারণার হাত থেকেও নিষ্কৃতি নেই।

এ সব ক্ষেত্রে করণীয় কি ?

বিক্রেতাকে ধরবার কোনো উপায়ের কথা বলতে পারি না। তবে সন্দেহ হলে অনায়াসে আর একটি কাজ করা যায়। বাটখারা আর জিনিসের পাল্লা বদলাবদলি করে দেওয়ার কথা বিক্রেতাকে বলা চলে। বাটখারার পাল্লায় জিনিস আর জিনিসের পাল্লায় বাটখারা চাপালে বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আমাদের লাভ।

কিন্তু বিক্রেতা তাতে রাজি হবে কি ?

এ এমন একটা যুগে আমরা এগিয়ে আসছি যখন অল্প খাদ্য-বস্তুতে শারীরিক বিভিন্ন চাহিদা মেটানোর কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে। চর্বন, চোষণ, লেহন এবং পান সমেত আসন বিছিয়ে আয়োজন করে খাওয়ার পরিবেশ এবং সময় দিনে দিনে সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। ভবিষ্যৎ সেদিন নিশ্চয় খুব বেশি দূরের কথা নয় যখন অ্যাসপিরিন বড়ির মত সংক্ষেপিত খাদ্য বটিকা ভাত-ডাল তরি-তরকারি, মাছ-মাংস, দুধ-ঘিয়ের বদলে সারাদিনের প্রয়োজনীয় শক্তি জোগাবে।

এ যুগেরও এ রকম একটি খাদ্যবস্তুর কথা মনে পড়ে। বটিকা নয়। কিন্তু সহজে গলাধঃকরণ করা যায়। এর নাম মধু।

সামান্য কয়েক ফোঁটা মধু। কিন্তু শারীরিক শক্তি জোগাতে তার অসামান্য ভূমিকা আছে। সুস্বাস্থ্যের জন্যে ভিটামিন, খনিজ পদার্থ আর তার সঙ্গে আরও যাদের কথা আমরা জানি, সে সবের অনেকগুলিই আছে এই মধুতে।

দেড় লিটার দুধ বা ১০টা ডিম যে পুষ্টি জোগায় ওই সামান্য মধু দেবে ঠিক সেই রকমেরই পুষ্টি। আর শক্তি? তাও কম কিছু নয়। শুনলে অবাক হবার কথা, ওইটুকু মধুতে যে শক্তির হিসেব পাওয়া যায়, তা ৩২০০ ক্যালোরির অনুরূপ।

বসন্ত জাগ্রত দ্বারে—শীঘ্রই টিকা লউন, এই সতর্ক বাণীর সঙ্গে আমাদের সকলেরই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে যখন শহরে বা গ্রামে টিকা নেওয়ার ধুম দেখা যায়, তখন সে টিকা নিঃসন্দেহে বসন্তের টিকা।

টিকা নেওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ? এর উদ্দেশ্য শরীরে কোনো রোগের প্রতিষেধক সৃষ্টি করা। যদি আমরা এমন কোনো ভাইরাস পাই, সে ভাইরাস শরীরে রোগ সৃষ্টি করে না, কিন্তু শরীরে কোনো প্রতিষেধক উৎপন্ন করে, তাহলে সেই ভাইরাসই ওই বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে ঔষধ এবং প্রতিরোধক হিসেবেও ব্যবহারের উপযুক্ত। জীবজগতে ভাইরাস জাতীয় রোগের ক্ষেত্রে ভাইরাস নিয়ন্ত্রণের একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি টিকা প্রয়োগ। দেহের স্বাভাবিক আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধ ব্যবস্থা সেই টিকা অবলম্বনে রোগ নিরাময় করে তোলে এবং দেহকে সজীব ও সুস্থ রাখবার চেষ্টা করে।

সাধারণভাবে টিকা দুই ধরনের। এর একটি কিল্‌ড্ ভ্যাকসিন এবং অন্যটি লিভিং ভ্যাকসিন। লিভিং ভ্যাকসিনের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটিতে কৃত্রিম উপায়ে রোগ সৃষ্টির ক্ষমতা বিনষ্ট করা হয়। কিন্তু টিকা প্রয়োগের প্রতিক্রিয়ায় লিভিং ভ্যাকসিন শরীরে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে। কিল্‌ড্ ভ্যাকসিনের প্রয়োগেও ভাইরাসের অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয়। কিন্তু কিল্‌ড্ ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে লিভিং ভ্যাকসিনের তুলনায় অধিক ভাইরাস প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ লিভিং ভ্যাকসিনে ভাইরাস নিজের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং অ্যান্টিবডি গঠনের নতুন উৎস সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু কিল্‌ড্ ভ্যাকসিনে টিকা হিসেবে যে ভাইরাসের শরীরে অনুপ্রবেশ ঘটে অ্যান্টিবডি সৃষ্টির সময়ে তাই-ই একমাত্র উৎস থেকে যায়। আমাদের পরিচিত কলেরা, টাইফয়েডের টিকা কিল্‌ড্ ভ্যাকসিনের উদাহরণ। পোলিওর যে টিকা গলাধঃকরণ

করা হয় তা লিভিং ভ্যাকসিনের দৃষ্টান্ত। লিভিং ভ্যাকসিনের দৃষ্টান্ত বসন্তের টিকাতেও।

কী ভাবে এই টিকা তৈরি হয় ? সাধারণভাবে গরুর পেটে টিকার ভাইরাস আঁচড় কেটে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এর পর গরুর পেটে যখন বসন্ত দেখা দেয় তখন তা থেকে চেঁছে নিয়ে গ্লিসারিন মিশিয়ে তরল টিকার প্রস্তুতি। বসন্তের টিকা হিসেবে এই তরল টিকারই প্রচলন ছিল এতদিন। কিন্তু ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে ওই তরল টিকার কিছু কিছু ত্রুটি ধরা পড়ে। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ—এ দেশে ওই তরল টিকার জীবাণু তাড়াতাড়ি বিনষ্ট হয়। কিন্তু যদি ওই টিকা ফ্রিজ-ড্রায়েড করা হয়, তা হলে গরমে তা দ্রুত বিনষ্ট হয় না এবং এর কার্যকারিতা অনেক দিন অক্ষুণ্ণ থাকে।

ফ্রিজ-ড্রায়েড টিকার আর একটা উপযোগিতা—যথেষ্ট সংখ্যায় ভাইরাস যুক্ত করে এই টিকার প্রস্তুতি সম্ভব। এই যথেষ্ট সংখ্যা কমপক্ষে এক একটি সিসিতে ১০ কোটি। ফলে ব্যবহারিক জীবনে তার কার্যকারিতা আরও বিশিষ্ট এবং আরও উন্নত। ফ্রিজ-ড্রায়েড টিকার ক্ষেত্রে গরুর দেহ থেকে যে বসন্তের পুঁজ নেওয়া হয় তাকে নানা প্রক্রিয়ায় ফ্রিজ-ড্রায়েড রেখে পরে গ্লিসারিনের সঙ্গে মিশ্রিত করে শরীরে প্রয়োগ করা হয়।

বর্ত্তমান পৃথিবীর সর্বত্রই বসন্ত দূরীকরণে এই ফ্রিজ-ড্রায়েড টিকার প্রচলন আছে। আমাদের দেশেও এর উৎপাদন এবং প্রচলন রয়েছে। এখানে এই টিকার প্রথম প্রচলনের সময়ে অধিকাংশ টিকাই আনা হত রাশিয়া থেকে। আমদানির এই সূত্র ধরে আমাদের দেশে এই টিকা রাশিয়ান টিকা নামে পরিচিত।

আমাদের দেশে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি স্বাভাবিক এবং বাৎসরিক ব্যাপার। প্রতি বছরই তারা আসে, হয় সে এখানে, নয় তো ওখানে। তার জন্যে যে শস্য নষ্ট হয়, পরিমাণ তার কম নয়। কিন্তু যে শস্য উৎপন্ন হতে দেখি, তার সবটারও ব্যবহারিক উপযোগিতা থাকে না, পোকায় তার যথেষ্ট ক্ষতি করে। চালের পোকার কথা ধরা যাক। চালের পোকা সবাই চিনি। এই পোকা চালের মধ্যে ঢোকে এবং চালগুলো খেয়ে একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেয়। এইভাবে প্রতি বছর চালের গুদামে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়, তার কোনো পরিসংখ্যান আছে কি না জানিনা, কিন্তু পরিমাণে তা যথেষ্ট। গম, যব এবং অন্যান্য শস্য সম্পর্কেও ওই কথা।

পোকামাকড়ের উপদ্রব বন্ধ করার জন্যে রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োগ আজকাল এক পরিচিত প্রক্রিয়া। কিন্তু রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োগ মানুষের ক্ষেত্রে সব সময় নিরাপদ এমন কথা বলা চলে না। সেখানে স্বাস্থ্যের ক্ষতি এবং পরিবেশ দূষিত হওয়ার একটা আশঙ্কা থেকে যায়। তা ছাড়া পোকামাকড়দের আর একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। তাদের দমন করার জন্যে যে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সেই রাসায়নিক দ্রব্যের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রেও তারা এক আশ্চর্য প্রতিবন্ধকতা গড়ে তুলতে পারে। ফলে তখন অনভিপ্রেত সহ-অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমানে নির্বীজকরণ এদিক দিয়ে বোধ হয় সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি। মানুষের এবং পুরুষ মানুষের ক্ষেত্রে ভেসেকটমি অস্ত্রোপচার বংশবৃদ্ধি রোধ করে। পোকামাকড়ের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা অনেকটা অনুরূপ।

এখন নির্বীজ করা কি ভাবে হবে সেটাই গবেষণার বিষয়। বিদেশে এ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং সাফল্য দেখা গিয়েছে। গবাদি পশুর উপরে যে Screw-worm fly বসে ক্ষতের সৃষ্টি করে

তা এদের প্রচুর ক্ষতি করে। এদের পুরুষগুলোকে Cobalt-60 এর বিকিরণের সাহায্যে নির্বীজ করে আমেরিকায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে—নির্বীজকরণে সাফল্য অর্থাৎ বংশবৃদ্ধি অনিবার্যভাবে রোধ করা। আমাদের এখানেও চালের পোকার নির্বীজ করার জন্য গবেষণা চলেছে।

আগামী একদিন চালের পোকা নির্মূল হবে এমন আশা সুদূর-পরাহত নয়। মশা মাছি নিয়ে এ ধরনের গবেষণা হয় না কেন? তা হলে তো দেশ থেকে একদিন মশা মাছিরও মূলোচ্ছেদ সম্ভব হতে পারে।

আমাদের সুখ, সোহাগ এবং সৌন্দর্যের বিভিন্ন উপকরণগুলির মধ্যে সীসে আছে এবং তার পরিমাণ কম নয়—আমাদের অনেকেরই এরকম একটা ধারণা। ধারণা সত্য হলে আশঙ্কিত হওয়ার কারণ থাকে। সীসে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং শরীরে তার ক্রমিক সঞ্চয়ে তা শরীরকে অসুস্থ করে তুলতে পারে।

কিন্তু আবির, সিঁদুর, কুমকুম বা ওই জাতীয় বস্তুগুলিতে সীসে থাকার কারণ বোঝা সহজ নয়। পুরাকালে এই জাতীয় জিনিসগুলি তৈরি করা হত শ্বেত মৃত্তিকা বা লোধ্র রেণু, মঞ্জিষ্ঠা রস বা অলক্ত রস দিয়ে রঞ্জিত করে। আজকাল কেয়োলিন, ব্ল্যাঙ্ক-ফিক্সে বা ব্যারাইট ইত্যাদিকে কৃত্রিম রঞ্জক পদার্থ দিয়ে রং করে এই ধরনের বিবিধ রঙীন পাউডার তৈরি করা হয়। এগুলি বাজারে 'রেড লেক্স' নামে পরিচিত। এর সঙ্গে ভেজাল হিসেবে যা চলতে পারে তা হল রেড লেড। কিন্তু রেড লেক্সের সঙ্গে রেড লেড মেশানোর কোনো ন্যায্য যুক্তি আছে বলে মনে হয় না।

মিশ্রণের সচয়াচর দুটি কারণ থাকে। এক: যখন তা বস্তুটির পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু রেড লেড এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়। দ্বিতীয় কারণ: যখন তা ভেজাল হিসেবে ব্যবহার করা চলে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও একটি কথা আছে। একটি বস্তু ভেজাল হিসেবে কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য যখন সেই বস্তু মূল বস্তুর তুলনায় অনেক সুলভ। কিন্তু আজকের দিনে রেড লেডের দাম রেড লেক্স-এর দামের বহুগুণ বেশি।

ফলে আবিরে সিঁদুরে নয়, কেবল পেন্ট তৈরির জন্যে অনেক সময়ে রেড লেক্স-এর সঙ্গে কিছুটা রেড লেড মেশানো হয়।

সুরমা প্রসঙ্গের সীসে মিশ্রণের অভিযোগ। কিন্তু এ সম্পর্কে মনে রাখা প্রয়োজন যে, হলুদ গুঁড়োর মধ্যে লেড ক্রোমেট অসাধু ব্যবসায়ীরা লাভ করার জন্যে মেশায়। সুতরাং বহুকাল ধরে

পরীক্ষিত নানাবিধ চক্ষুরোগ থেকে মুক্ত থাকার নিত্য ব্যবহার্য ঔষধ, শোধিত সুরমাকে বাতিল করে দেওয়া সাধু কর্ম নয়। ইউনানি ও আয়ুর্বেদে খনিজ লব্ধ সুরমা (Black Antimoni Sulphide), কর্পূর ইত্যাদি বিবিধ ভেষজ সহযোগে ঊর্ধ্বপাতন করে শোধন করার বিধি আছে। এইভাবে শোধিত সুরমার মধ্যে Lead Sulphide থাকার সকল সম্ভাবনার অবলুপ্তি ঘটে।

সুতরাং অনুরাগীদের মনোরঞ্জনের জন্যে মহিলাদের সুরমা পরা চলতে পারে। কপালে কুমকুম আর সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়াতেও আপত্তি দেখি না।

শীতের পাখিরা কোথা থেকে আসে ?

শীতের সময়ে চিড়িয়াখানায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আগন্তুক যারা, আসে সারি বেঁধে নিয়মমত, তারা আর কেউ নয়, আকাশের কোল থেকে নেমে আসা বাতাসে সহস্র কণ্ঠ আর কম্পন তুলে এক ঝাঁক পাখি—শীতের অতিথি। এরা চিড়িয়াখানায় বাসা বাঁধে না। কিন্তু শীতের সময়টুকুতে এদের নিত্য যাওয়া-আসা। সাধারণত অক্টোবরের শেষ থেকে এরা আসতে শুরু করে। প্রথমে সংখ্যায় কম। তারপর ক্যালেণ্ডারে যেই মাসের পাতা বদলায়, শীত আর আপন পরিবেশ গড়ে তোলে, তখন এদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। নভেম্বর, ডিসেম্বরে চিড়িয়াখানায় যত পাখি আসে, সংখ্যায় তারা প্রচুর, প্রায় দশ বারো হাজারের মত। আসে এরা প্রত্যহ—ভোরের আলো ফুটেছে এরকম সময়ে; সারাদিন চিড়িয়াখানায় কাটায়, তারপর যেই দিন ফুরিয়ে আসে, সূর্য অস্তমুখীন হয়, অমনি তারা ফিরে চলে। একসঙ্গে নয়, বিচ্ছিন্ন হয়েও এরা ফেরে না, এরা চলে দলে দলে, ছোটবড় গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে।

শীতের পাখিরা সারাদিন চিড়িয়াখানায় কাটিয়ে সন্ধের অন্ধকারে কোথায় ফিরে যায়? অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, এরা যায় সাধারণত সল্‌ট লেক বা সুন্দরবন অঞ্চলে। কিন্তু সল্‌ট লেকে পাখিদের বসবাসের এতদিন যে অনুকূল পরিবেশ ছিল, এখন তা হারিয়ে গেছে। ফলে যারা ফিরে চলে, তাদের সকলেরই লক্ষ্যস্থল সাধারণভাবে সুন্দরবন। এত দূরের পথ, কি ভাবে দিনের শেষে নিশানা ঠিক রেখে তারা যায়, কিভাবে ভোরের প্রথম আলোয় তারা ফিরে আসে, আমাদের সকলের কাছেই তা এখনও বিস্ময়ের কারণ হয়ে আছে।

বিদেশে মৌসুমী পাখি নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, এখনও চলেছে। কোন্ শক্তিতে ঋতুতে ঋতুতে পাখিরা পথ চিনে দেশান্তরী হয়, দূর দূরান্তে যায়, আবার সময়মত ডেরায় ফিরে আসে? পাখিদের স্থান পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা

তাঁদের পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলস্বরূপ যে কটি শক্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল সূর্য। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অথচ দিকনির্দেশক, নিয়মানুবর্তী, প্রত্যক্ষযোগ্য এমনটি সূর্য ছাড়া আর কি আছে? কে জানে আমাদের চিড়িয়াখানায় যত পাখি আসে শীতের অতিথি হিসেবে তারা হয়তো সূর্যকে অবলম্বন করেই তাদের চলার পথের নিশানা ঠিক রাখে।

শহর এবং শহরতলী অঞ্চলে অজস্র খাল, বিল, ডোবা থাকা সত্ত্বেও শীতের এই অতিথিরা কেন চিড়িয়াখানায় এসে বাসা বাঁধে?

তার দুটি কারণ আছে। এক: এদের নিরাপত্তা—সে নিরাপত্তা আর অন্য কোথায় পাওয়া যাবে? দুই: খাদ্যের প্রাচুর্য—একদিকে গম ভাঙ্গা, ঘাসের দানা, ভুট্টা ভাঙ্গা, অন্যদিকে বিলে শামুক কেঁচোর অপর্যাপ্ত খাদ্যসম্ভার।

শীতের অতিথি হিসেবে চিড়িয়াখানায় বিভিন্ন ধরনের যত পাখি আসে তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল, Lesser whistling teals, Greater whistling teals, Garganey, pintail, combduck প্রভৃতি।

প্রতি বছর শীতের সময়ে শহরে নতুন নতুন সার্কাস পার্টির মত নতুন নতুন পাখির দল যে আসে চিড়িয়াখানায় দিনটুকু কাটানোর জন্যে, তা নয়। Lesser whistling teals—কালো পাখির এক ঝাঁক। সেই ঝাঁকের সঙ্গে এক Albino বা সাদা পাখি আসত প্রত্যেকবার চিড়িয়াখানায়। সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত ব্যাপারটা। কিন্তু এক বছর আকাশে বুক দিয়ে ডানায় ভর করে সে এল না পরিচিত দলটির সঙ্গে। সবাই অবাক হল। কিন্তু সে হারাল না। এল সে নিউ মার্কেটের বিক্রেতার কাছ থেকে খাঁচায় বন্দী হয়ে। এখন সে পাখিটিকে চিড়িয়াখানাতেই দেখতে পাওয়া যায়।

শীতের পাখিরা শীত ফুরোলে চলে যায়। শুধু চিড়িয়াখানা থেকে নয়। সুন্দরবন অঞ্চল ছেড়েও। তখন তাদের লক্ষ্যস্থল ভারতের উত্তর অংশ এবং অনেকের আবার সাইবেরিয়া অঞ্চল। অনেক দূরের পথ—কিন্তু যারা নিশানা ঠিক রেখে চলতে জানে দূরত্ব তাদের আটকায় না। তারপর শীতের হাওয়ায় আবার যখন তারা ফিরে আসে তখন তাদের যাতায়াত শুরু আমাদের এই পরিচিত আকাশে।

গোলমাল করা ভাল নয়। অতিরিক্ত শব্দোচ্ছ্বাস—তাকে যতদূর সম্ভব বর্জন করে চলা উচিত। সে মারাত্মক এবং ক্ষতিকারক। পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা এমনিতে সে ব্যাহত করে, স্বাচ্ছন্দ্যেরও অভাব ঘটায়, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, আমাদের সে বধির করে আমাদের অবশিষ্ট জীবনকে অর্থহীন, ফ্যাকাসে করে তুলতে পারে।

গোলমাল কি ? কোলাহল কাকে বলে ?

এ হল অপ্রয়োজনীয় এবং প্রয়োজন-মাত্রাতিরিক্ত শব্দ। আমাদের কর্ণকুহর একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যন্ত্র। যে উচ্চমাত্রার শব্দ সে সহ্য করতে পারে তা সামান্যতম শব্দ, অর্থাৎ যে শব্দ কানে এল কি এল না, বোঝা গেল কি গেল না—এমন শব্দের চেয়ে প্রায় ৫০ লক্ষ গুণ বেশি। শব্দের এই বিপুল মাত্রাকে, শব্দ যে চাপ সৃষ্টি করে তার একক ডেসিবেলে, ০ থেকে ১৩৪ মাত্রার মধ্যে ব্যক্ত করা চলে।

এ কথা ঠিকই যে, আমাদের আধুনিক জীবনের সর্বত্রই দিনে দিনে গোলমাল এবং শব্দের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পথে ঘাটে বিচিত্র যানবাহনের ধ্বনিব্যঞ্জনা, পথযাত্রীদের বিক্ষিপ্ত কলরোল, নানাবিধ যান্ত্রিক শব্দ মিলিতভাবে ধ্বনিকে যে উচ্চগ্রামে উন্নীত করে ডেসিবেলের মাত্রায় তা রীতিমত ঊর্ধ্বমুখীন, কিন্তু এই শব্দজগতে অভ্যস্ত আমরা সহজে তা বুঝতে পারি না। কিন্তু পথিপার্শ্বে যদি কোনো টেলিফোন বুথ থেকে টেলিফোন করতে হয়! অবস্থাটা সেই সময়ে নিশ্চয় হৃদয়ঙ্গম হবে। সাধারণ কথাবার্তার জন্যে ৬০ ডেসিবেলই যথেষ্ট। অবশ্য পারিপার্শ্বিক যদি শব্দমুখর হয়, তা হলে আমাদের অজ্ঞাতসারেই কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে উন্নীত হবে। কিন্তু শব্দমুখরতা যদি আরও বৃদ্ধি পায় এবং ৮০ থেকে ৮৫ ডেসিবেলের মধ্যে থাকে তা হলে খুব জোরে কথা বলেও টেলিফোনের অন্য প্রান্তের মানুষটিকে হয়তো কোনো রকমে বক্তব্য শোনাতে পারি,

কিন্তু তার উর্ধ্বে ৯০ ডেসিবেলে উচ্চকণ্ঠেও অন্য প্রান্তে বক্তব্য পৌঁছে দেওয়া অসম্ভব।

রাস্তাঘাটে শব্দের মাত্রা অনেকগুলি বিষয়ের উপরে নির্ভরশীল। দ্রষ্টা বা শ্রোতা কতদূরে আছেন তা নিশ্চয় একটা উল্লেখযোগ্য দিক। তা ছাড়া যানবাহনের সর্বমোট সংখ্যা, গড় গতি, যান-বাহনের মধ্যে ট্রাকের সংখ্যা, রাস্তার ঢাল, পার্শ্ববর্তী অঞ্চল স্বাভাবিক বা কৃত্রিম প্রতিবন্ধক। এই সব দিকগুলি বিবেচনা করে শব্দের মাত্রা নির্ণয় করা চলে। কিন্তু ব্যাপারটা খুব সহজ বলা যায় না। অবশ্য হাই-ওয়ে দিয়ে গাড়ি ছুটে চলার ক্ষেত্রে হিসেব অনেকাংশে সোজা। সেখানে এক ঘণ্টার হিসেবে ট্রাক বা ওই ধরনের গাড়ি এবং অন্যান্য গাড়ি কত যাতায়াত করে, তাদের গড় গতি এবং দ্রষ্টা থেকে দূরত্বই যথেষ্ট।

কিন্তু রাস্তাঘাটে শব্দের মাত্রা সর্বত্র উন্নীত নয়। কলকাতা শহর মানেই হাওড়া বা শেয়ালদা স্টেশন এমন কথা বলা চলে না। সেখানে ভিকটোরিয়া বা গড়ের মাঠের ঘাস আছে। আউটরামের ঘাট আছে। টেলিফোনে বাক্যালাপও কখনো কখনো নির্জনে, সঙ্গোপনে, আভাসে আলাপে করার প্রয়োজন ঘটে। এই অস্ফুট বা অর্ধস্ফুট আলাপে ডেসিবেলে শব্দ যে পর্যায়ে উন্নীত হয়, তা ২০-এর কাছাকাছি, স্বাভাবিক কথোপকথনে যা ৬০-এ নির্দিষ্ট থাকে।

পথেঘাটে যানবাহনের শব্দ এবং আমাদের মিলিত কণ্ঠস্বর ছাড়া অধিকাংশ উচ্চৈঃস্বর জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। হয় তা যন্ত্রের থেকে উদ্ভুত, না হলে তা যন্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সৃষ্ট। দীর্ঘকাল এই উচ্চৈঃস্বরের পরিমণ্ডলে থাকলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের অবনতি ঘটে এবং কালক্রমে তা বধিরতা বহন করে আনে। এমনিতেই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণ-শক্তি কমে আসে। তারপর উচ্চৈঃস্বরে তা আরও দ্রুততর করে তোলে। শব্দকোলাহল এবং বধিরতা প্রসঙ্গে যে সব শিল্পের নাম করা যায়, তাদের মধ্যে লোহা এবং ইস্পাত-শিল্প, মোটর গাড়ি নির্মাণ কারখানা, ছাপাখানা প্রভৃতির কথা বলা চলে।

বিদেশে চিকিৎসাবিদেরা নানা পরিসংখ্যান থেকে দেখেছেন যে, জীবিকার ক্ষেত্রে নিয়মিত ৯০ ডেসিবেল শব্দের পরিমণ্ডলে থাকা শ্রবণেন্দ্রিয়ের পক্ষে মারাত্মক, যেখানে ৮০ ডেসিবেল ততটা নয়। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহনশীলতার ক্ষেত্রে ৮৫ ডেসিবেলকে উর্ধ্বসীমা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে এই জাতীয় জীবিকায় যাঁরা থাকেন তাঁরা সচরাচর কর্ণকুহরে তুলো প্রয়োগ করেন। দুই হাতের দুই তর্জনী দিয়ে কান বন্ধ করলে শব্দ কমে আসে। কর্ণকুহরে তুলো প্রয়োগে ৫ থেকে ১৫ ডেসিবেল পর্যন্ত শব্দের মাত্রা কমিয়ে আনা চলে। কিন্তু এত সতর্কতা সত্ত্বেও যদি কোথাও কখনো হঠাৎ ১৪০/১৫০ ডেসিবেলের মত শব্দ সৃষ্টি হয় এবং সে শব্দের পরিমণ্ডলে আমরা থাকি, তবে তা বরাবরের মত আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের ক্ষতি করতে পারে।

উচ্চ মাত্রার ভয়ানক শব্দের কথা শুনে মনে হতে পারে লঘু শব্দই ভাল। কিন্তু দীর্ঘকালীন লঘু শব্দের পরিমণ্ডলে থাকাও শ্রবণেন্দ্রিয়ের পক্ষে ক্ষতিকর।

আমরা বায়ু দূষিতকরণ বা জল দূষিতকরণের কথা জানি। এখন শব্দ দূষিতকরণও দূষিতকরণের একটি অবলম্বন। সে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে আমাদের বধিরতার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে। নিঃসন্দেহে শ্লো-পয়সনিং! যাকে আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় না, অথচ যে ক্ষতি করে চলেছে তার চেয়ে মারাত্মক আর কি হতে পারে?

এদেশে আমাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য, বাহুল্য বর্জিত একটি সুষম খাদ্য-তালিকা কী হতে পারে যা দ্রব্যমূল্য বিচারে নয়, কিন্তু উৎকর্ষে সকল অভিভাবকের কাছে আকাঙ্ক্ষিত এবং সকল শিশুর পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। দরিদ্র দেশের পক্ষে এরকম খাদ্যতালিকাই সকল অভিভাবক অনুসন্ধান করেন।

এরকম একটি খাদ্য তালিকা এখানে উপহার দেওয়া হল। ৫।৬ মাস বয়স থেকে মায়ের দুধে শিশুর প্রয়োজন যখন সম্পূর্ণ মেটে না, তখন থেকেই এই খাদ্য তালিকা গ্রহণ করা চলতে পারে। একটি ১ বছরের শিশুর কথা ধরা যাক। ২৪ ঘণ্টায় তার প্রয়োজন ৯০০ ক্যালোরি। এই ৯০০ ক্যালোরির বণ্টন দিনে পাঁচবার খাদ্যের প্রয়োগে। সকাল ৭টা, ১১টা, বিকাল ৩টা, ৫টা এবং রাত ৯টা। সকাল ১১টায়, বিকাল ৩টায় এবং রাত ৯টায় শিশুর খাদ্য ২০০ ক্যালোরি হিসাবে, বাকি দুবার ১৫০—এই পরিমাণে। অর্থাৎ তিনটি ভারী খাদ্য এবং দুটি হালকা।

আগে একটি হাল্কা খাওয়ার কথা উল্লেখ করি। মনে করা যাক, সময় সকাল ৭টা। তখন প্রয়োজন ১৫০ ক্যালোরি। ১ আউনস দুধ ২০ ক্যালোরি। তাহলে ১ কাপে যদি ৫ আউনস ধরে তো সেখানে ১০০ ক্যালোরি। বাকি ৫০ গ্রামের জন্যে দামী ফলমূলের দরকার নেই। ১ চামচ মুড়িতে ১০ ক্যালোরি, সুতরাং মুড়িতে কিছুটা, বাকিটা গুড়ে বা কলায় বা স্বল্প পরিমাণে এদের মিশ্রণে। কারণ একটা কলায় প্রায় ১৪ ক্যালোরি আর ১ চামচ গুড়েও ক্যালোরি অনুরূপ পরিমাণ।

আর ভারি খাদ্য ?

সেখানে ডাল চালের মিশ্রিত খিচুড়ির মত আর কিছু নেই। এই উদ্ভিদ-প্রোটিন যেমন সুলভ, তেমনি স্বাস্থ্যপ্রদ। প্রাণীজ-প্রোটিনে যে সব অপরিহার্য অ্যামিনো-অ্যাসিড আছে, তার অনেকগুলিই এতে পাওয়া যায়।

কিন্তু একটা কথা।

মাছ, মাংস বা ডিম নিয়মিত একটু দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তা না হলে সালফার যুক্ত অ্যামিনো-অ্যাসিডের অভাব থাকে, যা শিশুর মানসিক পুষ্টিকে ব্যাহত করতে পারে। শিশুকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই খাদ্য তালিকাই শিশুর সকল প্রয়োজন মেটাবে। শিশুর মানসিক এবং শারীরিক পুষ্টিকে বজায় রাখার জন্যে স্বল্পতম মূল্যে এর চেয়ে সুষম খাদ্য তালিকা আর কি হতে পারে?

বসন্তের হাওয়া যতই মধুর হোক না কেন, এ কথা ঠিক যে ভারত-বর্ষের অন্যান্য কর্মব্যস্ত শহরের তুলনায় কলকাতার বাতাস অনেক বেশি দূষিত। রসায়নের যে সব নাম বাতাসকে সাধারণভাবে দূষিত করে তোলে, তাদের মধ্যে আছে সালফার ডাই-অকসাইড, নাইট্রোজেন ডাই-অকসাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড এবং বাতাসে ভেসে বেড়ানো বিভিন্ন পদার্থ। এই সব পদার্থ বোম্বে, দিল্লী, কানপুর এবং কলকাতার মত সুবৃহৎ শহরগুলির আকাশ-বাতাসকে কতখানি ভারি করে রেখেছে ?

বাতাসকে দূষিত করায় যার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য তা হল সালফার ডাই-অকসাইড। কলকাতার বাতাসে সেই সালফার ডাই-অকসাইডের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। সারাদিনের অবস্থা অবশ্য বোম্বে, দিল্লী, কানপুরের সঙ্গে তুলনীয়, কিন্তু অপরাহ্ণ যেই মধুর হয়ে আসে, তখন বাতাসে সালফার ডাই-অকসাইড হু হু করে বেড়ে চলে এবং পরিবেশ অন্যান্য শহরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়।

আর একটি গ্যাস আছে যার নাম কারবন মনো-অকসাইড। কর্মচঞ্চল রাস্তায় অফিসের সময়ে যানবাহন যখন বেশি থাকে তখন শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক এই গ্যাসটির পরিমাণও বাতাসে অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন মোটরযানগুলি থেকে যে কালো কালো ধোঁয়া বের হয়, তাতেই এই গ্যাসগুলি বায়ুমণ্ডলে বেশি পরিমাণে ছড়িয়ে পড়ে। নিউইয়র্ক, শিকাগো শহরের মত যানবহুল শহরের বাতাসে কারবন মনো-অকসাইডের পরিমাণ যত, কলকাতা তার সমতুল। অবস্থাটা যে মারাত্মক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কলকাতার এই অবস্থার জন্যে দায়ী বহু গাড়ির চলাচল এবং ওই গাড়িগুলির ইঞ্জিনের দুরবস্থা।

তা ছাড়া কয়লাখনি অঞ্চলের কাছাকাছি হওয়ায় কলকাতায়

অপেক্ষাকৃত কম দরে প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। এ জন্য কয়লাই এখানকার প্রধান জ্বালানি। আর অন্নের সংস্থানে প্রত্যেক বাড়িতেই উনুন জ্বলে। আবহাওয়া দূষণে তাই কয়লা এক উল্লেখযোগ্য উৎস।

আরও আছে। কলকাতার চারপাশের শিল্প কারখানা থেকে প্রচুর সূক্ষ্ম ধূলিকণা বাতাসে উৎক্ষিপ্ত হয়। সে ধূলিকণাও বাতাসকে দূষিত করে তোলে।

দূষিত বাতাসে কলকাতা সবদিক দিয়েই অন্য শহরের উপরে। তা ছাড়া কলকাতা সম্পর্কে নিরাশ হওয়ার আরও অন্য কারণ আছে। বোম্বে, দিল্লী, কানপুরে সাধারণভাবে বাতাস বয় জোরে সারা বছরের হিসেবেই। কলকাতাতেও বাতাস বইলে আঁচল ওড়ে। কিন্তু সে কেবল এপ্রিল, মে আর জুন মাসে। আর গড় হিসেবে অন্য শহরের তুলনায় তাও এমন আশাব্যঞ্জক কিছু নয়। ফলে দূষিত বাতাসে শহর অবরুদ্ধ। অবরুদ্ধ ঘরের বদ্ধ বাতাস নির্গমনের জন্যে উল্টোমুখী পাখা থাকে, কিন্তু শহরের অবরুদ্ধ বাতাসকে মুক্ত করবে কে?

যে অভ্যাস হিতকারী নয়, এমন অভ্যাসের বশবর্তী হওয়া উচিত নয়, একথা সবাই স্বীকার করবে। ঘুমের বড়ি না খেলে কারোর রাত্তিরে ঘুম আসে না। এ অভ্যেস ভাল অভ্যেস নয়। সকালে এক কাপ গরম চা না হলে অনেকের সারাদিনের জন্যে তৈরী হওয়া চলে না। এমন অভ্যেসই বা হবে কেন ? সকলেই জানি কারণের সঙ্গে কার্য থাকবে, থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু এ রকম কার্য কারণ সম্পর্ক ভাল বলা চলে না।

রাত্তিরে ঘুমের বড়ি না খেলে ঘুম যাঁর আসে না তিনি কি করবেন ? সকালে এক কাপ গরম চা না খেলে যিনি সারাদিনের জন্যে তৈরি হতে পারেন না, তিনি এক কাপ চাকে কি ভাবে বাদ দিয়ে চলবেন ?

মানুষকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে প্রকৃতি। একে আবার সহায়তা করে খাদ্য এবং অন্যান্য অবলম্বন।

ঘুমের জন্যে কি করতে হবে ?

মায়েরা শিশুদের ঘুম পাড়ান খাওয়ানোর পরেই, ঘর অন্ধকার করে গুন গুন স্বরে গান গেয়ে চলেন মায়েরা—বাচ্চার চোখে ঘুম নেমে আসে। আমাদের নিজেদের বেলায় শিশুদের ঘুম পাড়ানোর এ পদ্ধতিটি মনে রাখতে হবে। খাওয়ার পরেই বিছানায় শুতে যেতে হবে। ঘর অন্ধকার থাকবে কিম্বা মৃদু আলো জ্বলবে। কোনো একঘেয়ে শব্দের পরিবেশে থাকলে ভাল, না হলে, ১, ২, ৩, করে গুণে চলবার চেষ্টা করতে হবে ১০০০ পর্যন্ত। বা স্বার্থ জড়িয়ে নেই এমন চিন্তাও করা চলে। বিষয়-সম্পত্তির কথা অনেকের মনে পড়বে। কিন্তু না, বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারের কথা ভাবা উচিত নয়। আর বিকেল বেলায় খোলা হাওয়ায় একটু বেড়ানো দরকার।

সকালে চায়ের বদলে কি খাব ?

ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে মুখ চোখ ধুয়ে এক গেলাস জল পান

করতে হবে। এবার কিছু পৈটিক ব্যায়াম। তারপর প্রকৃতির আহ্বানের অপেক্ষায় থাকতে হবে। নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। নিজেকে প্রকৃতিস্থ করতে ১৫।২০ এমন কি ৩০ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি নিশ্চয় সহায়তা করবে।

খাদ্য তালিকাও একটু অনুকূল রাখা দরকার। বেল, আম, কমলা-লেবু, পেয়ারা, পেঁপের দিকে একটু নজর দিতে হবে। আর রাত্তিরে খাওয়ার পরে একটু দুধ খেতে পারলে ভাল হয়।

কলকাতার উর্ধ্বলোক থেকে সমুদ্রকূলবর্তী হুগলি নদীর দুই তীর সন্নিহিত অজস্র কলকারখানা নজরে আসে। যে সব শিল্প উৎপাদনে এই কলকারখানা স্থাপিত তাদের মধ্যে আছে কাগজ, বস্ত্র, চামড়া, পাট, রবার, রং, পলিথিন, ভেজিটেবল তেল, রাসায়নিক এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত দ্রব্য ও ঔষধপত্র, তাছাড়া আরও কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য শিল্প আছে। নিঃসন্দেহে এই সব শিল্প সংক্রান্ত নদীতীরবর্তী বিভিন্ন কারখানা উৎপাদনের সময়ে যে সব পদার্থ অব্যবহার্য এবং অপ্রয়োজনীয় হিসেবে বর্জন করে, অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে তা নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়।

শিল্প উৎপাদনে নিয়োজিত বিভিন্ন ধরনের কারখানায় নানাবিধ রাসায়নিক এবং অন্যান্য বস্তুর নদীগর্ভে নিয়মিত নিক্ষেপ কি নদীকে মৎস্য সংরক্ষণ এবং প্রতিপালনের অনুপযুক্ত করে তোলে? হুগলির এবং খাড়ি সন্নিহিত অঞ্চলে মৎস্যসংখ্যা কি অধোমুখী এবং তা কি এই কারণেই? যদি তাই হয় তাহলে অনতিদূর ভবিষ্যতে কি হুগলি মৎস্যশূন্য হবে এবং কানাই মাস্টারের বিড়াল ছানাটির মত আমরা শূন্যগর্ভ হুগলি নদীকে কাঙ্গালীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করব?

খাড়ি সন্নিহিত অঞ্চলে নদীর জল দূষিতকরণের যে সব উপাদান মৎস্য চাষ এবং প্রতিপালনে ক্ষতির কারণ হিসেবে গণ্য করা যায় তাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এক : উত্তাপ, পঙ্কিলভাব এবং পলি। মৎস্য প্রতিপালনে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা হিসেবে বিবেচিত। এদের তারতম্য জলজ জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং মৎস্যদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া আসা বা কোথাও বসবাসকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে। মৎস্যজীবনে উত্তাপ, পঙ্কিলতা এবং পলিকে প্রাকৃতিক মাত্রা হিসেবে বিবেচনা করা চলতে পারে।

দুই : প্রাকৃতিক মাত্রার মত রাসায়নিক মাত্রার কথাও উল্লেখ্য।

নদী যে দূষিত পদার্থ গ্রহণ করে তা জলের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তন নিয়ে আসে। এই সব দূষিত উপাদানের মধ্যে আছে কারবন ডাই-অক্সাইড, দ্রবীভূত অকসিজেন তৈল এবং আরও অনেক যা জলজ জীবনের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত।

তিন ঃ প্রাকৃতিক এবং রাসায়নিক মাত্রার মত জীবগত মাত্রাও আছে। মাছের খাদ্য, ডিম, লার্ভা—এগুলি জীব সংশ্লিষ্ট মাত্রার অন্তর্ভুক্ত, দূষিতকরণের ফলে যাদের স্বাভাবিক অবস্থা ক্ষুণ্ণ হতে দেখা যায়।

হুগলির নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত বিভিন্ন পরিত্যক্ত পদার্থ নদীর জলকে কতটা দূষিত করে সঠিক বিচারে তা বলা দুঃসাধ্য। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে তা পরিমাপের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা নজরে আসে। পরিত্যক্ত বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে শুধু কলকারখানার পরিত্যক্ত পদার্থ নেই, সেই সঙ্গে আছে গৃহস্থের উচ্ছিষ্ট এবং মিউনিসিপ্যাল আবর্জনা। আধুনিক এক সমীক্ষায় জানা যায় যে, খাড়ি সন্নিহিত নদীগর্ভে প্রত্যহ যে তরল অব্যবহার্য হিসেবে পরিত্যক্ত হয়, তার পরিমাণ প্রায় ২৫ কোটি গ্যালনের সমান। এই ২৫ কোটি গ্যালনের মধ্যে আছে ৪৬১৬ টন কঠিন পদার্থ। এই কঠিন পদার্থের ভেতর আবার ১০৫৭ টন ভাসমান এবং ১২৫১ টন দ্রবীভূত।

দূষিতকরণের এই সব বিভিন্ন মাত্রা মৎস্য প্রতিপালন এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোনো দিক দিয়েই অনুকূল নয়।

নদী যেখানে শীর্ণ এবং যেখানে জোয়ার ভাঁটা তেমনভাবে খেলে না সেখানে দূষিত সমস্ত উপকরণের ধারাবাহিক সঞ্চয় নদীভূমিকে সংকীর্ণ করে তোলে। ফলে ইলিশ মাছের মত যে সব মাছ সাগরের নোনা জল ছেড়ে মিঠে জলে ডিম ছাড়ার জন্যে আসে তারা বাধা পায়। ইলিশ মাছ যে কখনো সাগরের দিকেই পাওয়া যায় তার একটি কারণ এই বাধাজনিত অবস্থা হতে পারে।

১৯৫৭ সালের পূর্বে হুগলির খাড়ি থেকে যত মাছ পাওয়া যেত তার শতকরা ৪০ থেকে ৭০ ভাগই ছিল ইলিশ মাছ। তারপর

ধারাবাহিকভাবে এই সংখ্যার অবনতি ঘটে। এই অবনতির বিষয় সম্পর্কে যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা থেকে মনে হয় যে, খাড়ির উত্তর ভাগে যেখানে ইলিশ মাছ ডিম ছাড়ে, সেখানকার জল দূষিতকরণই এই মাছের সংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণ। আমরা যদি হুগলিতে ইলিশ মাছ সংরক্ষণের এবং প্রতিপালনের কথা চিন্তা করি তাহলে হুগলির খাড়ির উত্তর ভাগে বিশুদ্ধকরণের বিষয়টি চিন্তা করে দেখা দরকার।

অন্যান্য নদীর জলের তুলনায় হুগলি নদীর জলের ক্ষেত্রে আর একটা অসুবিধা আছে। সেটি মাছের প্রধান অবলম্বন উদ্ভিদ্ জাতীয় খাদ্য সম্পর্কে। হুগলির জল এরকম যে এখানে উদ্ভিদ্ জাতীয় খাদ্য বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ দেখা যায় না। দূষিতকরণের ফল, জোয়ার ভাঁটার প্রভাব এবং খরস্রোত এই ধরনের উদ্ভিদ্ জাতীয় খাদ্য বৃদ্ধির পরিপন্থী। খাদ্যাভাব মাছেদের সমাবেশ কমিয়ে আনে। ফলে জল যদি বসবাসের অনুপযুক্ত না হয়, তা হলেও খাদ্যাভাব মৎস্য প্রতিপালনে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করে।

আরও দু-একটি বিষয়ের কথা বলা দরকার। এদের মধ্যে আছে নদীর জলের উত্তাপ। কলকারখানা থেকে যেখানে উত্তপ্ত পদার্থ নির্গত হয়ে নদীর জলের স্বাভাবিক তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটায় সেখানে মাছেরা কি অবস্থার সম্মুখীন হয়?

সাধারণভাবে সেই সব অঞ্চলের মাছেরা ওই আবহাওয়া বসবাসের অনুপযুক্ত বলে মনে করবে এবং অনুকূল স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, কোনো কোনো মাছ নিজেদের এই পরিবর্তিত আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাদের কিছু কিছু পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হয়। খাদ্যের পরিমাণ এবং খাদ্য বস্তুও উত্তাপের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। বাইরের উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে যে সব মাছের দৈহিক উত্তাপের পরিবর্তন ঘটে, সেই সব মাছের বেলায় ১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপ বৃদ্ধি শারীরিক পুষ্টি সাধনে দৈহিক বিভিন্ন ক্রিয়ার পরিমাণ দ্বিগুণ করে তোলে। ফলে কেবল পরিবর্তিত

আবহাওয়ার জন্যে খাদ্যমাত্রার যে বৃদ্ধি দরকার মাছেরা যদি সে খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করতে না পারে, তাহলে তারা নিঃসন্দেহে সেই অঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র যাবে। অধিকাংশ মাছই তাপমাত্রার একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ডিম ছাড়তে পছন্দ করে এবং এই তাপমাত্রার পরিবর্তন জীবন সৃষ্টিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

জলের দ্রবীভূত এবং ভাসমান কঠিন পদার্থসমূহও অনেক সময়ে মাছেদের জীবন সংশয়ের কারণ হতে পারে। দূষিতকরণে যেখানে ভাসমান পদার্থের পরিমাণ বেশি সেখানে মাছের কানকোতে এই সব ভাসমান পদার্থ সঞ্চিত হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা মাছেদের শ্বাস রোধ করে।

দূষিত পদার্থের বিষক্রিয়াও চিন্তার অন্যতম কারণ। তখন জলে দ্রবীভূত অকসিজেনের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার জন্যে মাছ কানকোর ভেতর দিয়ে অকসিজেন দ্রুত পাম্প করে। ফলে কানকোর উপরে বিষের সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ে। এমন হতে পারে যে, বিভিন্ন কারখানা থেকে নির্গত বিষাক্ত পদার্থের পরিমাণ এককভাবে মারাত্মক নয়, কিন্তু মাছের উপরে তার মিলিত প্রতিক্রিয়া ক্ষতিকর।

হুগলিতে মৎস্য সংরক্ষণ এবং প্রতিপালনের ক্ষেত্রে দূষিতকরণের বিভিন্ন উপাদান—পার্থিব, রাসায়নিক ও জৈবিক—মৎস্য চাষে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ এবং একে অবলুপ্তির পথে টেনে নিয়ে চলেছে।

এদিকে যদি বৈজ্ঞানিক পর্যায়ে দৃষ্টি না দেওয়া হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে হুগলি মৎস্যশূন্য হয়ে পড়বে।

আমাদের দেশে উর্ধ্বতন মহলে একটি হাস্যাস্পদ বক্তব্য প্রায় শোনা যায় যে, মৃত্যুর কারণ অনাহার নয়। উপস্থাপন ভঙ্গীটা এ রকম যে, যিনি অল্প বাংলা শিখেছেন তিনি অনাহারকে থ্রমবোসিস, ক্যানসার, কলেরা, নিউমোনিয়ার মত একটা রোগ মনে করবেন। কিন্তু অনাহার রোগ নয়, সে হল রোগের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ—যার সঙ্গে আমাদের দেশের অনেক স্ত্রী-পুরুষের স্বাস্থ্য জড়িত আছে।

অনাহার এবং তার সঙ্গেই আছে অপুষ্টি। এই দুয়েরই সর্বদা সহ-অবস্থান নজরে আসে। এতে যারা ভুগছেন, তাঁদের মধ্যে শতকরা প্রায় ২০ জনের প্রধানত ফুসফুসে যক্ষ্মা আছে এবং সত্য কথা, সে যক্ষ্মা মারাত্মক ধরনের। প্রাথমিকভাবে অপুষ্টি নিয়ে আসে অজীর্ণতা কিন্তু পরে এর জন্যই পরিপাক শক্তি হ্রাস পায় এবং কোনো খাদ্য-বস্তুই পরিপাক করা সহজ হয় না। তা ছাড়া অপুষ্টির জন্যে সর্দি, কাশি এবং ব্রঙ্কাইটিস দেখা যায়। অপুষ্টিজনিত রোগে যাঁরা ভোগেন তাদের মধ্যে ব্যাসিলাই জীবাণু ঘটিত অর্থাৎ আমাশয় জাতীয় রোগও দেখা যায়। তা ছাড়া এর জন্যে কোনো না কোনো জীবাণু অথবা রাউনগু ওয়ার্ম বা কেঁচো জাতীয় আন্ত্রিক পরজীবী রোগীকে আক্রমণ করে, রোগীর খাদ্যে ভাগ বসায়, রোগ সংক্রামিত করার আশঙ্কা বাড়িয়ে তোলে।

সুস্থ শরীরকে রোগ জীবাণু যতটা কাহিল করে অপুষ্টিতে তা আরও মারাত্মক হয়ে আসে। ফলে অপুষ্টি রোগ সংক্রমণে সহায়তা করে। আবার বিপরীত দিক দিয়ে রোগ সংক্রমণের সঙ্গে আরও অপুষ্টি দেখা দেয়। এইভাবে একটি দুষ্টচক্র নিয়ত আবর্তন করে চলে। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে এই চক্র আরও বিশেষ ভাবে শিশুদের পুষ্টিকে ব্যাহত করে। সেখানে শুধু অপুষ্টি নয়, সেই সঙ্গে আছে পরিবেশ—সে পরিবেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিকূল। ফলে অপুষ্টির সঙ্গে যেখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ মেশে, সেখানে অবস্থা

গুরুতর আকার ধারণ করে। শিশুদের কথা, গর্ভবতী মেয়েদের কথা একবার ভাবা যাক। এদের জন্যে এবং সকলের জন্যে প্রয়োজন যেমন পুষ্টির তেমনি স্বাস্থ্যকর পরিবেশের। শুধু খাদ্য নয়, বরং বক্তব্য এইভাবে বলা দরকার যে, পরিবেশ যেখানে দূষিত, দুর্গন্ধময়, সেখানে খাদ্যের উন্নতিতেও কিছু করা সম্ভব নয়।

তবু আমাদের পারিপার্শ্বিক এই অবস্থায় এবং খাদ্যের অপ্রতুলতায় রোগ প্রতিরোধের জীর্ণ ধর্ম নিয়ে অনাহারে মৃত্যু হয় না এমন কথা বলায় কি যুক্তি থাকতে পারে?

জীবনে অন্ধত্ব এক চূড়ান্ত অসহায় অবস্থার নিদর্শনস্বরূপ যা নিঃসন্দেহে আমাদের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। চোখ দিয়ে আমরা দেখি, সহজ চিন্তায় বুঝি তা, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিচারে আমাদের দৃষ্টিশক্তি প্রধানত পাঁচটি মাধ্যমের উপরে নির্ভর করে। Cornea, Aqueous humour, Lens, Vitreous, humour, Retina হল সেই পাঁচটি মাধ্যম। এদের মধ্যে যে কোনো একটি আক্রান্ত হলেই দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হয়। বিভিন্ন মাধ্যমের ভেতরে এ্যাকুয়াস হিউমার, ভিট্রেয়াস হিউমার এবং রেটিনা সচরাচর আক্রান্ত হয় না। বাকি থাকে লেন্স এবং কর্নিয়া। আক্রান্ত লেন্স নিরাময়যোগ্য। শল্য চিকিৎসার সাহায্যে লেন্স অপসারণ এবং চশমার ব্যবহারে স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে। থাকল অবশিষ্ট কর্নিয়া।

এই কর্নিয়াই সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় এবং দৃষ্টিহানি ঘটায়, কারণ কর্নিয়া আছে চোখের সামনে, একেবারে বাইরের স্তরে।

কর্নিয়া কি? চোখের সামনে স্বচ্ছ অংশের নাম কর্নিয়া। স্বচ্ছ অংশের অস্পষ্টতার সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হওয়ার একান্ত আশঙ্কা। তখন নতুন কর্নিয়া ছাড়া স্বচ্ছতা এবং দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক-ভাবে ফিরিয়ে আনার বিকল্প কোনো ব্যবস্থা থাকে না। বর্তমানে আমাদের দেশে কর্নিয়াজনিত দৃষ্টিহীনতা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

ভারতবর্ষ বিশ্বের যে সব বিষয়ে প্রথম তার মধ্যে অন্ধত্বও একটি। আগের কারণগুলি ছাড়াও অন্ধত্ব নানাভাবে আসতে পারে। সব রকমের অন্ধত্বই যে নিরাময়যোগ্য তা নয় এবং যা নিরাময়যোগ্য তাও আবার সর্বক্ষেত্রে সাধারণের আর্থিক অবস্থার অনুকূল নয়। কিন্তু অন্ধত্ব যেখানে কর্নিয়াজনিত সেখানে অসুস্থ কর্নিয়ার পরিবর্তে নতুন একটি কর্নিয়া স্থাপন সহজ এবং সুলভ চিকিৎসা। পদ্ধতিটি কর্নিয়া গ্রাফটিং নামে পরিচিত। তখন পুনর্বার দৃষ্টিশক্তি অনায়াসে ফিরে পাওয়া যায়।

এই কর্নিয়া গ্রাফটিংয়ের উদ্দেশ্যে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে চক্ষু ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়েছে। কয়েক হাজার লোক কর্নিয়া গ্রাফটিংয়ের জন্যে অপেক্ষাও করছেন অথচ দুর্ভাগ্যের কথা সংগৃহীত কর্নিয়ার সংখ্যা এত অল্প যে দীর্ঘকাল বাদে কর্নিয়া গ্রাফটিংও দৃষ্টি পুনর্লাভে সহায়তা নাও করতে পারে। তখন কর্নিয়া সংক্রান্ত অস্বচ্ছতায় রেটিনার কর্মক্ষমতাও ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

কর্নিয়াজনিত উর্ধ্বমুখী অন্ধত্বের সংখ্যাকে কমিয়ে আনার জন্যে যা প্রয়োজন তা হল প্রচুর সংখ্যায় কর্নিয়া সংগ্রহ—জীবিত নয়, মৃত ব্যক্তির। সঙ্গে সঙ্গেই একটি অসহায় মানুষকে সুস্থ এবং সার্থক করে তোলা। দেহের বিকৃতি নেই, মৃতকে বেশিক্ষণ চিকিৎসকের নিয়ন্ত্রণে থাকতে হয় না অথচ মানবসেবার একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা ছাড়া বিকল্প কোনো পন্থা আছে বলে মনে হয় না।

ধোঁয়া নয়, কুয়াশা নয়—ধোঁয়াশা। তাতে আছে ধোঁয়ায় সেই চোখ জ্বালা জ্বালা ভাব, আর আছে কুয়াশার পরিচিত অস্পষ্টতা। প্রতি বছর শীতের সন্ধ্যেয় শহরের রাস্তায় রাস্তায় এই ধোঁয়াশার নিত্য অভিজ্ঞতা। ভারি বাতাস, শান্ত পরিবেশ, তারই মধ্যে ধোঁয়া আর কুয়াশার মিশ্রিত কুণ্ডলী—সমস্ত আবহাওয়া অস্বচ্ছ এবং সম্মুখের দৃষ্টি, দৃষ্টির পরিমণ্ডলের মধ্যেই রুদ্ধ। তাই শীতের সন্ধ্যেয় বড় রাস্তায় দূরের বাস যতক্ষণ না একেবারে নাগালের মধ্যে ততক্ষণ তার গন্তব্যস্থলের লিখিত বর্ণাক্ষর কে উদ্ধার করবে ? কে বলবে সামনের এই সংকীর্ণ গণ্ডী যার ভেতরেই কেবলমাত্র দৃষ্টির স্বাচ্ছন্দ্য—তার ওপারে কি আছে, কে আছে ?

শীত আসার সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস ভারি—আবহাওয়া শান্ত এবং নিঃসন্দেহে স্থির। সেই অবস্থায় সন্ধ্যের আভাসের মুহূর্তগুলিতে বাড়িতে বাড়িতে, তেলেভাজার দোকানগুলির সম্মুখের ফুটপাথে উনুন জ্বলে ওঠা এক অস্বস্তিকর এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। তা ছাড়া সরকারি পরিবহনের ধূম উদ্গিরণ, কল কারখানার চিমনি, নানা কারণে দূষিত বাতাস—ধোঁয়া নয়, কুয়াশা নয়, অথচ দুয়েরই আভাস মেশানো এমন একটা ভাবের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

চলন্ত বাসের কথা দিয়েই শুরু করি। সরকারি পরিবহণ—ডিজেলেই তাকে টেনে নিয়ে যায়। ডিজেলের মূল উপাদান কারবন। এই কারবনের সঙ্গে অকসিজেনের দহনে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাইতেই বাস চলে। দহন কার্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হলে ডিজেলের কারবন বাতাসের অকসিজেনের সঙ্গে ঠিকমত সংমিশ্রিত হয়ে কেবল-মাত্র কারবন ডাই-অকসাইড গ্যাস উৎপাদন করে। কিন্তু পরিবহণের ক্ষেত্রে নানা কারণেই তা সম্ভব নয়। ফলে কারবন ডাই-অকসাইডের সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুলি গ্যাস নির্গত হয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষাক্ত গ্যাস কারবন মনো-অকসাইড। কিন্তু গ্যাসের

কথা থাক। দহন কার্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত না হলে বাতাসের ধূলিকণার মত আরও একটি পদার্থ নির্গত হয়—এটি হল অদগ্ধ কারবনের কণা, বর্ণে কালো, পরিপূর্ণ দহনের অভাবে কারবন ডাই-অকসাইড আর কারবন মনো-অকসাইড গ্যাসকে অবলম্বন করে যেটি বাতাসে মিশ্রিত হয়।

উনুন যখন জ্বলে, তখন চলন্ত বাসের মত সেই একই কথা, একই যুক্তির অবতারণা। কয়লা মানেই কারবন এবং সত্যি কথা বলতে কি, ডিজেলে নয় বরঞ্চ কয়লার ভেতরেই আমরা কারবনকে তার আদিরূপে দেখতে পাচ্ছি। ফলে উনুনে আগুন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দহন কার্য শুরু—আর দহন অর্থই সেই কারবন ডাই-অকসাইড গ্যাস আর অদগ্ধ কারবন কণার নির্গমন।

কল-কারখানার বেলাতেও সেই একই প্রসঙ্গ। যেখানেই কারবন এবং দহন প্রক্রিয়া সেখানেই প্রধানত কারবন ডাই-অকসাইড গ্যাস এবং কিছু পরিমাণ অদগ্ধ কারবন থাকার সম্ভাবনা।

দহনের ক্ষেত্রে অনেক জ্বালানিতে কারবন ছাড়াও হাইড্রোজেন, অকসিজেন, নাইট্রোজেন থাকে। এবং পরিমাণে যৎসামান্য হলেও কোনো কোনো জ্বালানিতে সালফারের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দহন কার্য যদি সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়, তা হলে কোথাও ধোঁয়ার উদ্ভব হওয়ার কথা নয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দহনের কার্য সম্পূর্ণ হওয়ার জন্যে প্রাথমিক পর্যায়ে যা প্রয়োজন, তা হল প্রচুর পরিমাণ অকসিজেন এবং যথেষ্ট পরিমাণ উত্তাপ। কিন্তু দহনের ক্ষেত্রে দুটি প্রয়োজনকেই সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মেটানো কঠিন। ফলে ধোঁয়ার উৎপত্তি।

কিন্তু কারবন আর দহন ছাড়াও ধোঁয়াশার ক্ষেত্রে আরও অনেক কথা বলবার আছে। শহরের বাতাস, এমনিতেই সে দূষিত এবং তাতে যে পরিমাণ ধূলিকণা ছড়িয়ে আছে তা কখনোই উপেক্ষা করা চলে না। ঘন বসতিপূর্ণ কলকাতা—অট্টালিকায়, অট্টালিকায় তার দেহ আচ্ছন্ন, তার পার্ক, লেক, উদ্যান অপস্রয়মান, তার ময়দানের

গাছের ছায়া দুর্লভ। আজ কলকাতায় খোলা মাঠ, বিশুদ্ধ বাতাস, উন্মুক্ত আকাশ কল্পনার বস্তু হয়ে আসছে।

ফলে এমনিতেই যখন আবহাওয়া দূষিত, তখন অফিসক্লান্ত শীতের সন্ধ্যেয় স্তব্ধ হাওয়ায় এবং ভারি বাতাসে ধোঁয়াচ্ছন্ন সে পরিবেশ যে আরও অনেক বেশি অস্বচ্ছ, অস্বাস্থ্যকর এবং অস্বস্তিজনক তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

তার ওপর ঠাণ্ডা হাওয়ায় বাতাসের জলীয় বাষ্পের ঘনীভূত রূপ বাতাসের ধূলিকণা, কারবনের কণাকে অবলম্বন করে সুস্পষ্ট এক একটি রূপ নিচ্ছে—ঠাণ্ডা মাটির উপরে যারা ছড়িয়ে আছে। তারাই সামনের দৃষ্টিকে অনেকাংশে অস্পষ্ট করে দিচ্ছে। যদি গ্রীষ্মকালের মত বাতাস উত্তপ্ত হত এবং দক্ষিণের বাতাস হু হু করে বইত, তাহলে নানা জাতীয় পদার্থের সংমিশ্রণ, অজস্র ধূলিকণা, বাতাসে স্থির থাকত না—বাতাসের টানে তারা চলে যেত দূর থেকে আরও দূরে, বাতাসের গতিকে অবলম্বন করে। কিন্তু বাতাস স্থির এবং শীতকালে ভারি বলে ধূলিকণারা মাটি ছাড়িয়ে অনেক উপরে নেই। তার ওপর শীতের হাওয়ায় জলীয় বাষ্প ঘন হয়ে এসেছে—তারা ধূলিকণাগুলিকে অবলম্বন করে পরিচ্ছন্ন এক একটি আকৃতি নিচ্ছে।

এই যে আকৃতি—এককত্বে এ উল্লেখযোগ্য না হলেও মিলিত চেহারায় এরই মধ্যে ধোঁয়া ধোঁয়া ভাব, অস্বচ্ছ দৃষ্টি, অস্পষ্টতার আভাস। পরিচয়েও তখন এ স্মগ—ধোঁয়া আর কুয়াশার মিলিত রূপে যার নাম ধোঁয়াশা।

ব্যাপারটা শুনে অবাক হতে হবে, কিন্তু এ কথা ঠিক যে এমন একটা দিন আসছে, যখন ব্যাপকভাবে খাদ্য সংরক্ষণের জন্যে আমাদের পরমাণুশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। গরমের দিনে আলু, পেঁয়াজ, সবজি তাড়াতাড়ি শুষ্ক হয়ে আসে, ফল তাড়াতাড়ি পেকে যায়, শস্যকণায় অতি দ্রুত পোকা ধরে, ফলে যত বিভিন্ন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হচ্ছে তার সবটুকুও গ্রহণ করবার অবস্থায় থাকে না। এমনিতে আমাদের দেশে খাদ্যশস্য যে পরিমাণে উৎপন্ন হচ্ছে, তা সমভাগে বণ্টন করলে কোন্ খাদ্যবস্তু ভাগ্যে কতটা জুটবে বলা কঠিন, তার ওপর সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও যদি বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা একটা স্থায়ী সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে বিজ্ঞানোন্নত যুগে তা গভীর পরিতাপের বিষয় মনে হবে।

পরমাণু শক্তির সাহায্যে খাদ্যবস্তুকে আকাঙ্ক্ষিত অবস্থায় রাখার পদ্ধতি সহজ। আজ এই পদ্ধতি গড়ে উঠেছে বিকিরণকে অবলম্বন করে। অথচ প্রয়োজন তার বেশি নয়। আলু পেঁয়াজকে তার স্বাভাবিক টাটকা চেহারায় রাখার জন্যে যে পরমাণু বিকিরণের প্রয়োজন, পরিমাণ তার অতি সামান্য—সংখ্যার উল্লেখে ৬ থেকে ১০ কিলোর‍্যাড মাত্র।

আলু পেঁয়াজ শুকনো হয়, কিন্তু গ্রীষ্মের উত্তাপে আম কলার দ্রুত পাক ধরে। সেই পাক ধরাকে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে কিছুটা শ্লথ করা যায় সামান্য বিকিরণের সাহায্য নিয়ে। আমের পক্কতাকে সাত দিনের মত আর কলার পক্কতাকে ১৫ দিন পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া চলে মাত্র ২৫ থেকে ৫০ কিলোর‍্যাড বিকিরণ প্রয়োগ করে।

আর আছে শস্যের কথা। বিকিরণে শস্যের পোকা নষ্ট করে। তার লার্ভা এমন কি, তার ডিমেরও বিনাশ ঘটে। ফলে উৎপন্ন শস্যের অপচয় বন্ধ হয়। রাসায়নিক দিক দিয়েও

খাদ্যশস্যের পোকা ধ্বংসের চেষ্টা চলে। কিন্তু নির্ভয়ে তা গ্রহণ করা যায় না।

বিকিরণ যে শুধু খাদ্য সংরক্ষণ করে তা নয়, খাদ্যশস্যের স্বাদ, গুণ, চরিত্র বজায় রাখে। এবং সেই সঙ্গে আমাদের স্বাস্থ্যও। ফলে ভবিষ্যতে বিকিরণ সিঞ্চিত খাদ্য গ্রহণে আমাদের অস্বস্তির কোনো কারণ থাকবে মনে হয় না।

ডাক্তারের আশ্বাসবাণীও অনেক সময়ে আমাদের নিশ্চিন্ত করে না। ক্লান্তিবোধ, বুক ধড়ফড়, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস, অবসন্নতা—নিত্য অভিজ্ঞতা অথচ এদিকে পাল্‌স বিট ঠিক, স্টেথিসকোপে বুকে পিঠে সুস্থতার নির্দেশ দিচ্ছে এবং রোগের অন্য উপসর্গেরও অভাব রয়েছে। ফলে ডাক্তারের সুস্পষ্ট অভিমতও কাল্পনিক রোগীকে সম্পূর্ণ হতাশ করে।

কিন্তু রোগ তো শরীরে নেই—আছে মনে। মনের অসুখ—Anxiety neurosis। সে অসুখ স্টেথিসকোপে ধরা পড়বে কেন? ধরা পড়বেই বা কী করে?

বিজ্ঞানীদের ধারণা যদি একশোজনের হিসেব নেওয়া যায়, তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, প্রায় চারজন মানুষ আছেন, যাঁরা এই অসুখে আক্রান্ত। অনেকে মনে করেন যে, যতই সভ্যতার বিকাশ এবং শিল্পের উন্নতি, ততই এই মনের অসুখের বিস্তার ঘটছে। সমাজে পুরুষ এবং নারী সকলের মধ্যেই এই রোগ লক্ষ্য করা যায়। বরং নারীরাই পুরুষের তুলনায় এই মনের ব্যারামে বেশি আক্রান্ত হন। চতুর্দিকে সজাগ দৃষ্টি ফেললে দেখা যাবে, যেখানে পুরুষের সংখ্যা এক, সেখানে সচরাচর দুজন নারী আছেন, যাঁরা এই রোগটিতে ভুগছেন।

মনের এই অসুখ বংশগত একথা বলা যায় না। কিন্তু সংসর্গ নিঃসন্দেহে এই রোগের বিস্তার ঘটায়। যে বাড়িতে বাবা-মার একজন এই অসুখে ভুগছেন, তাঁদের ছেলেমেয়েদের কেউ কেউ এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন, আর বাবা-মা দুজনেরই যদি এই অসুখ থাকে, তাহলে পাঁচটি ছেলেমেয়ের কয়জনেরই এই রোগে পড়বার আশঙ্কা।

মনের এই অসুখ কেন হয়?

বিজ্ঞানীরা রোগীর রক্ত পরীক্ষা করে মানসিক এই বিচিত্র অবস্থার একটা উল্লেখযোগ্য জবাব খুঁজে পেয়েছেন। সে জবাবের মূল

উপাদান ল্যাকটিক এসিড। যাঁর দেহের রক্তে এই উপাদানগত পরিমাণ বেশি, তাঁরই মানসিক দুশ্চিন্তার শিকার হবার আশঙ্কা। মানব স্বেচ্ছাসেবী নিয়েও বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়েছে। সুস্থ মন, অথচ রক্তে এই উপাদানটির সংমিশ্রণে বিপরীত ফলাফল।

দৈহিক শ্রমের সময়ে আমাদের দেহে গ্লুকোজের পরিবর্তন হয়। শক্তির উৎপাদনে এ এক অপরিহার্য প্রক্রিয়া। সেই প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে ল্যাকটিক এসিডের উৎপত্তি। এর কিছুটা অংশ পরে কারবন ডাই-অকসাইডে এবং জলে পরিণত হয়। কিন্তু অধিকাংশ ভাগেরই রক্তে সংমিশ্রণ ঘটে এবং যকৃতে তা আবার গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়। ফলে রক্তে ল্যাকটিক এসিডে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই। কিন্তু মনের অসুখে ভুগছেন এমন মানুষের ক্ষেত্রে রক্তে এই উপাদানটির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যেখানে ল্যাকটিক এসিড সংক্রান্ত উপাদানের বৃদ্ধি, সেখানেই মনের দিক থেকে সুস্থ মানুষেরও বুক ধড়ফড়, অবসন্নতা এবং ক্লান্তির অনুভূতি লক্ষ্য করা যায়।

শুধু ভালোর শ্রেণী বিভাগ নয়, যা অনিষ্টকর গুরুত্ব অনুসারে তারও পর্যায়ক্রম সম্ভব। সুতরাং ভেজালেরও বাছবিচার চলতে পারে।

বাজারে যত রকমের ভেজালের প্রচলন, তার মধ্যে বিশেষ মারাত্মক সীসাজনিত ভেজাল। এ ভেজালের প্রাথমিক কোনো রোগ লক্ষণ নেই অর্থাৎ আপাতনিরাপদ। কিন্তু মুস্কিল এই যে, ওয়ান-ওয়ে ট্রাফিকের মত শরীরে এর যদি বা অনুপ্রবেশ ঘটে কোনো ভাবে, নিষ্ক্রমণ কখনো নয়। ফলে বারম্বার অনুপ্রবেশে শরীরে এর ক্রমসঞ্চয় এবং সে সঞ্চয় যখন একটি সীমা অতিক্রম করে তখন পক্ষাঘাতজনিত রোগের দুর্লক্ষণ ফুটে ওঠে।

এমনিতে খাদ্যদ্রব্যে কিভাবে সীসার ভেজাল আসে বোঝা দুষ্কর। চালে কাঁকর মাটি থাকার অর্থ সুস্পষ্ট কিন্তু খাদ্যবস্তুতে সীসার মিশ্রণ ? আমাদের নিয়মিত পাক ব্যবস্থায় যাতে সীসার মিশ্রণ ঘটতে পারে তা হল গুঁড়ো হলুদ। অন্তঃসারের চেয়ে বাইরের চাকচিক্যের দিকে আমাদের ঝোঁক বেশি। বিষাক্ত লেড ক্রোমেট হলুদ গুঁড়োয় ঔজ্জ্বল্য নিয়ে আসে। আর যা চকচকে, উজ্জ্বল তাই তো আমাদের বুদ্ধিতে খাঁটি এবং টাটকা। কিন্তু সেই চাকচিক্যের সঙ্গে যে এক মর্মান্তিক পরিণতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সে সম্পর্কে আমরা কজন সচেতন আছি ?

খেসারির ডালে কি বিষ আছে?

ভেজাল অনিষ্ট করে সে কথা সর্বজনবিদিত, কিন্তু নির্ভেজাল খাদ্যও যে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন একটা আশঙ্কা আছে, এবং সে আশঙ্কা খেসারির ডালে।

আশঙ্কা অমূলক নয়। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, খেসারির ডাল নিয়মিত এবং যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করলে পক্ষাঘাতজনিত কিছু কিছু দুর্লক্ষণ ফুটে ওঠে। পায়ের জোর কমে যায়, পদক্ষেপ মদ্যপের মত ঈষৎ অবিন্যস্ত হয়ে পড়ে; আঙুল, হাত এবং পায়ের গাঁট স্ফীত হয়।

খেসারির ডালে প্রধানত যে বিষের জন্যে এই অবস্থা, তার নাম আলফা অ্যামাইনো বিটা অকসালিল অ্যামাইনো প্রোপিয়নিক এসিড। খেসারির ডাল গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দেহে এই ধরনের পদার্থের নিয়মিত সংরক্ষণ চলে এবং এক সময়ে এই সংরক্ষণের মাত্রা যখন নদীর জলের মত বিপজ্জনক সীমা ছাড়ায় তখনই রোগের লক্ষণ ধরা পড়ে। পশ্চিমবাংলার মুর্শিদাবাদে এই রোগ সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায়।

খেসারির ডালের সঙ্গে রোগটির সম্পর্ক থাকলেও খেসারির ডাল খেলেই যে এই রোগের লক্ষণ দেখা যাবে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। অবস্থাটা নির্ভর করে ডালে বিষাক্ত পদার্থের পরিমাণের উপরে। আমরা আখ চিবোই। কিন্তু সব আখের মিষ্টত্ব সমান নয়। মিষ্টত্বের বেলায় যা দেখি খেসারির ডালে বিষের ক্ষেত্রেও অবস্থাটা তারই অনুরূপ। এই বিষ নির্ভর করে জমি এবং আবহাওয়ার উপরে। এবং আমাদের অভিজ্ঞতায় প্রতি বছরই যেমন জল-ঝড়ের পরিবর্তন ঘটতে পারে তেমনই একই জমির খেসারির বিষও পরিমাণে কম বেশি হতে পারে।

নগরজীবনের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে রোগজীবাণুর অতি পরিচিত বাহক মশা এক অস্বস্তিকর এবং চিরন্তন সমস্যা। শহরের দিকে একবার তাকানো যাক। লক্ষ্য করবো, সারা বছরের মধ্যে সাধারণত নভেম্বর থেকে মার্চের শেষ পর্যন্ত মশার প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি। গরমের সময় তেমন নয়, কিন্তু বর্ষা নামার পর যেই অনুকূল পরিবেশ দেখা যায়, অমনি মশা বাড়ছে সে পরিচয় আমরা পেতে শুরু করি। প্রাদুর্ভাব চলে শীতের শেষ পর্যন্ত। তারপর যেই আবহাওয়া বদলায়, দক্ষিণের বাতাস বইতে শুরু করে অমনি মশার পরিমাণ কমে আসে।

মশা কোথায় কম, কোথায় বেশি এই নিয়ে কিন্তু শহরের এক অঞ্চল আর এক অঞ্চলকে হিংসা করে। কলকাতার দিকে লক্ষ্য করি, পূর্বাঞ্চলে রেল লাইনের ওপার বরাবর এদিক দিয়ে সবার উপরে—সেখানে মশা সবচেয়ে বেশি। কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলেও মশা যথেষ্ট। ফলে মধ্য কলকাতার কেউ যদি ঢাকুরিয়া, কসবার কাউকে বলেন যে, আমাদের অঞ্চলে মশা তেমন নয় তবে তাতে অবিশ্বাস করার মত কিছু নেই।

মশার উৎপত্তিস্থল বদ্ধ জল। এই বদ্ধ জলে ডিম ছাড়ল মশা। তারপর পূর্ণতা লাভের জন্যে সে সময় নিচ্ছে দশদিন। এই সময়ে বদ্ধ জল যদি নিকাশ করা চলে, তাহলে মশা পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কিন্তু সব বদ্ধ জল নিকাশ করা সম্ভব নয়। সি এম ডি এ রাস্তা খুঁড়েছে। খোঁড়া রাস্তায় জল সরানো হবে কি করে? কলকাতা করপোরেশনের মশা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ মশার তেল ছড়ান বদ্ধ জলে। উদ্দেশ্য মশার লারভ্যার শ্বাস গ্রহণে বাধার সৃষ্টি এবং বংশবৃদ্ধি রোধ করা।

কলকাতা এবং তার আশেপাশের অঞ্চলের সেপটিক ট্যাঙ্কও মশার বংশবৃদ্ধির একটা অন্যতম কারণ। ভেন্‌টিলেশন পাইপ সেপটিক ট্যাঙ্কের—এই ভেন্‌টিলেশন পাইপ দিয়ে মশা গিয়ে নোংরা জলে

ডিম পাড়ে। আর বদ্ধ জলে যখন সে পূর্ণতা পায় তখন সে বেরিয়ে আসে ওই ভেন্টিলেশন পাইপ দিয়ে। সুতরাং দ্বিমুখী পথ হিসেবে পাইপ কাজ করে। ফলে যা প্রয়োজন তা হল ভেন্টিলেশন পাইপ দিয়ে মশার এই যাতায়াত বন্ধ করা। উপায় সহজ—জাল দিতে হবে ভেন্টিলেশন পাইপে। এ বিষয়ে কোনো নির্দেশনামা আছে কি না জানি না। নির্দেশনামায় সব হয় না। কিন্তু সিপটিক ট্যাঙ্ক অঞ্চলে সকলে যদি এ দিকে দৃষ্টি দেন, তাহলে মশককুলের জন্মনিয়ন্ত্রণে এ যে কিছুটা সহায়তা করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে এলার্জি শব্দটির প্রতি সাধারণ মানুষের সকলেরই একটা শ্লেষমিশ্রিত দৃষ্টিভঙ্গী আছে।

যে রোগের নাম আছে, সে রোগ যতই দুরারোগ্য হোক না কেন, তার একটা অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু নামহীন গোত্রহীন যে, যার কোনো নির্দিষ্ট পরিচয় নেই, তাকে অবলম্বন করে চিকিৎসা করা সাধারণ মানুষের কাছে একটা হেঁয়ালীমাত্র। তাই অনেকে রসিকতা করে বলেন, বহুপ্রচলিত এই এলার্জি শব্দটি মেডিক্যাল সায়েন্সের এক অসহায় এবং করুণ দিককে নিয়ে, যার আক্ষরিক অর্থ, 'আমি জানি না'।

এলার্জি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। জীবনের সমস্ত স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। খাওয়ার ক্ষেত্রে এলার্জি আছেই, তা ছাড়া এলার্জি লক্ষ্য করা যায় স্পর্শকে কেন্দ্র করে। এর উপরে আছে পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিক।

বিভিন্ন শ্রেণীর এলার্জির মধ্যে খাওয়ার ক্ষেত্রে চিংড়ি মাছকে নিয়ে এলার্জি সকলের পরিচিত, সার্বজনীনতার দিক দিয়েও সম্ভবত সে সকলের উপরে। চিংড়ি মাছ, খেতে সে যতই সুস্বাদু হোক অনেকে আছেন, সেটা তাঁদের অভিজ্ঞতার ফল, চিংড়ি মাছ যাঁরা সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে চলেন। তবু কোনো কারণে যদি অসতর্ক হন, তখনই প্রয়োজন হয় চিকিৎসকের। আর সেই প্রয়োজনের মুহূর্তে শরণাপন্ন ব্যক্তিটি চিকিৎসকের প্রত্যয় ভরা পরিচিত উক্তিটি শুনবেন—চিংড়ি মাছে আপনার এলার্জি আছে। অনেকের এলার্জি আবার পেঁয়াজে, কারো এলার্জি দুধে, কারো এলার্জি ডিমে। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া ছাড়াও এলার্জির আরও অনেক ক্ষেত্র আছে। এলার্জি আছে সাবানে—যেমনি সাবান ব্যবহার অমনিই চর্মরোগের উৎপত্তি—ফলে গায়ে মাখা দূরের কথা সাবানে যাঁদের এলার্জি তাঁরা সাবানে হাত পর্যন্ত দেন না। কেউ সিঁদুরে এলার্জি বোধ করেন—সিঁদুর প্রয়োগ

করলেই মাথায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়। অতএব সতীত্ব রক্ষার প্রয়োজন থাকলেও চিকিৎসকের নির্দেশে সীমন্তিনী হওয়ার সৌভাগ্যে তাঁরা বঞ্চিত। কারোর সঙ্গে এলার্জির সম্পর্ক ধুলো ময়লার, নাকে বেশি ধুলো ময়লা গেলেই শরীর খারাপ, জ্বরজ্বর ভাব, সর্দি-কাশি। আমি এমন মানুষ জানি রোদে বেরোলে যাদের গায়ে ফোস্কা পড়ে। এ থেকে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায় গ্রীষ্মের রোদকে এড়িয়ে চলা। এ সব দেখে বলতে পারি যে, আপাতদৃষ্টিতে কারণবিহীন বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে এলার্জি শব্দটি এমনভাবে প্রচলিত হয়েছে যে, অনেক সময়ে স্বাভাবিকতার চেয়ে মাত্রাতিরিক্ত অনুভূতি সংক্রান্ত পৌনঃপুনিকতা প্রসঙ্গে সামাজিক জীবনেও আমরা এলার্জি শব্দটি ব্যবহার করি। তাই এমন কথা শোনা অসম্ভব নয় যে, শাশুড়ী ঠাকুরণের প্রতি মেয়েটির এলার্জি আছে কিম্বা অফিসের বড়কর্তা সম্পর্কে কেরাণীটি কিছুটা এলার্জিসম্পন্ন। এলার্জি কথাটির অর্থ কি? সাধারণভাবে যে সব বস্তু থেকে দৈহিক প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা থাকে না, কোনো কোনো মানুষের ক্ষেত্রে সেইগুলি বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। সেই বিপর্যয়ের কারণ বস্তুগুলির সংস্পর্শে অতিরিক্ত দৈহিক সচেতনতা। আমাদের দেহে যে সব কোষ আছে, কারো বেলায় কোনো কোনো বস্তুর প্রভাবে সেগুলি অতিরিক্ত সচেতন হয়ে পড়ে। তখনই কোষগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর আসে এলার্জি। ফলে সেই ক্ষতিগ্রস্ত কোষগুলির জন্যে আমরা সর্দি, কাশি, এ্যাজমা, একজিমার সূত্রপাত লক্ষ্য করি। অতিরিক্ত সচেতনতার জন্যে যখন ফুসফুসের কোষগুলি আক্রান্ত হয় তখন দেখি এ্যাজমা, যখন নাসিকা অঞ্চলের কোষগুলির আক্রমণ ঘটে তখন আসে সর্দি-কাশি আর শরীরের চর্মের বেলায় শুরু হয় একজিমার।

অন্যান্য রোগের তুলনায় এলার্জির একটা অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যও আছে। সেটি এই যে, মূলত যে সব বস্তু থেকে এলার্জির সূত্রপাত, সেই সব বস্তু শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়, যেমন ঘরে যে বাতাস ভেসে বেড়াচ্ছে তার ধুলো, ফুলের রেণু। তা ছাড়া খাদ্য হিসেবে মাছ,

ডিম, দুধ, বাদাম, পেঁয়াজ প্রভৃতির কথা আগেই বলেছি। সাধারণ মাত্রায় এর কোনোটাই শরীরের অনিষ্ট করে না।

এলার্জি শব্দটির উৎপত্তি এই বিংশ শতাব্দীতে, ১৯০৬ সালে। এলার্জির পূর্বে যে শব্দটি প্রচলিত ছিল তার নাম Anaphylaxis—অর্থ, আত্মরক্ষাবিহীন, একটু গুছিয়ে বলতে গেলে, যে রোগে আত্মরক্ষা করার উপায় থাকে না। অর্থের এই ব্যাপকতাকে কমিয়ে আনা হল এলার্জি শব্দের মধ্যে। তখন সে পরিবর্তিত শক্তি বা অবস্থা বা প্রতিক্রিয়া—এই অর্থ বহন করে।

এই পরিবর্তিত শক্তি বা দৈহিক প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে আর একটি বস্তুর কথা বলতে হবে। এটির নাম এন্টিজেন। প্রোটিন বা প্রোটিন-কার্বোহাইড্রেট অণু মিশ্রিত পদার্থ এটি, যখন শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তখন একরকমের প্রতিবস্তুর উৎপত্তি ঘটে। ফলে পুনর্বার এন্টিজেনের প্রয়োগে দেহ সংরক্ষিত প্রতিবস্তুগুলি এই এন্টিজেনের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে কোষগুলিকে রক্ষা করে। প্রতিবস্তুর কার্যক্ষমতা সাধারণভাবে ব্যাক্টেরিয়াযুক্ত সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ প্রসঙ্গে। এবং মানবদেহের কোষগুলির সাহায্যেই এগুলি পুষ্ট হয় ও পূর্ণতা লাভ করে।

কিন্তু কোনো কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে কয়েক ধরনের প্রতিবস্তু আছে যা দেহটির কোষগুলি ঠিকমত রক্ষায় সমর্থ নয়। তখনই কোষগুলির আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা দেখা যায়। এরই পরিণতিতে এলার্জির সূত্রপাত ঘটে। ফলে যে সব পদার্থ থেকে সুস্থ মানুষের শারীরিক অসুস্থতার সম্ভাবনা নেই, তার প্রভাবেই কোষদুষ্ট মানুষ এলার্জিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং বিপর্যস্ত হন।

আমাদের এদেশে বিভিন্ন এলার্জি সংক্রান্ত রোগে যত মানুষ কষ্ট পান তাঁদের সংখ্যা কম নয়। পরিসংখ্যানের দৃষ্টিতে ব্রঙ্কো-এ্যাজমায় যাঁরা কষ্ট পেয়ে থাকেন তাঁদের সংখ্যা সমগ্র জনসমষ্টির প্রায় ১·৫ শতাংশ হবে। সর্দি-কাশিতে যাঁদের এলার্জি আছে তাঁরা শতকরা ৩ থেকে ৪ ভাগ হবেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি বোধহয় চর্ম সংক্রান্ত এলার্জিজাত অসুখগুলি। বিভিন্ন হাসপাতালের সংগৃহীত

তথ্য থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, সমস্ত চর্মরোগের একটা উল্লেখযোগ্য অংশই এলার্জি সংক্রান্ত।

আমাদের ভারতবর্ষে এলার্জিবিশিষ্ট বিভিন্ন অসুখ-বিসুখ চিকিৎসা জগতের একটা বিশেষ অংশ অধিকার করে রেখেছে।

দৈর্ঘ্য যেমন মিটারে পরিমাপযোগ্য, ওজন গ্রামে, তেমনি গাড়ি ঘোড়ার মত শরীরকে সচল রাখার জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন, ক্যালোরিতে তার হিসেব রাখা চলে।

আমাদের শরীরের জন্যে দৈনিক যতটা ক্যালোরির প্রয়োজন, পরিমাণ তার কম নয়। সারাদিন অলস শয্যায় শায়িতা একটি মহিলার কথা সহজভাবে চিন্তা করা যাক। শুধু এই অবস্থার জন্যে শরীরের যে শক্তির প্রয়োজন তা হল ১৫০০ ক্যালোরি। স্বাভাবিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে দরকার আরও ৭০০ ক্যালোরি। তখন সবশুদ্ধ শক্তির প্রয়োজন ২২০০ ক্যালোরি।

এমনিতে ঘণ্টাখানেক বসে থাকায় বা লেখালেখিতে ১০০ ক্যালোরি খরচা। সংসারে সামান্য কাজকর্ম করলে, এর দ্বিগুণ পরিমাণ খরচের খাতায় ওঠে। কিন্তু দ্রুত হাঁটায় বা দারুণ পরিশ্রমে খরচ অস্বাভাবিক বেশিতে পৌঁছোয়—তখন খরচ ঘণ্টায় ৭৫০ ক্যালোরির কাছাকাছি।

স্বাভাবিক পুরুষ, নারীর ক্ষেত্রে খরচের হিসেব সম্পর্কে বলা যায় যে, সাধারণভাবে একটি পুরুষের প্রয়োজন ২৮০০ ক্যালোরি এবং মহিলারা যতই হেঁসেল ঠেলার কথা পুরুষদের শোনান, ২২০০ ক্যালোরিতেই তাঁদের কাজ চলে।

ডোবা, পুকুর বা ঝিলে আমরা অনেক সময়ে দেখি রঙ্গীন কার্পেটের মত ভাসমান এক সবুজ আস্তরণ—পাতিহাঁস ভেসে বেড়ায় সেখানে, মুখ ডুবিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করে। ওই যে বস্তুটি, উদ্ভিদবিদ্যায় ওর নাম Woolfia arrhiza। শালুক ফুলের মত তার মনোহারিত্ব নেই। পানিফলের মত তার খাদ্যমূল্য বা স্বাদের কথাও আমরা এতদিন শুনিনি। কিন্তু বর্তমানে প্রকৃতিতে সহজলভ্য এই জিনিসটির খাদ্য-মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা চলেছে।

বাজারে প্রোটিনের উর্ধ্বমূল্য আমাদের আয়ত্তের বাইরে। কিন্তু এই উদ্ভিদটির মধ্যে যে পরিমাণ প্রোটিন আছে এবং তার সঙ্গে কারবোহাইড্রেট, তা রীতিমত উল্লেখযোগ্য। আর সেই কারণে খাদ্য হিসেবে তা আমাদের কাছে আশাপ্রদও বটে। যদি ১০০ গ্রাম এই বস্তুটির শুকনো অবস্থায় খাদ্যগুণের একটা হিসেব নেওয়া যায় তাহলে এটিতে দেখতে পাব, প্রোটিন আছে ১৯'৮ গ্রাম এবং কারবোহাইড্রেট ৪৩'৬ গ্রাম।

অবশ্য খাদ্যমূল্য থাকলেই সব বস্তু আমরা গ্রহণ করি না। তা সহজ প্রাপ্য এবং ক্রয়সীমাকে অতিক্রম করে কিনা দেখা দরকার। ভারতের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে চাষযোগ্য এটির ক্ষেত্রে সে রকম কোনো সংশয়ের কারণ থাকতে পারে না। এ ছাড়াও আর একটি কথা আছে—তা হল আস্বাদ। স্বাদে যদি সে রসনাকে তৃপ্ত না করে, তা হলে তা গ্রহণে সকলেরই স্বাভাবিক অনাগ্রহ থাকবে।

পাতিহাঁসের খাদ্য—তা আমাদের কেমন লাগবে? কিন্তু না, পাতিহাঁসের রুচিকে নিন্দে করা চলে না।

সিলিনডারের গ্যাসের বহুল প্রচলন ব্যবহারিক বিবিধ সুবিধার জন্যে, কিন্তু শূন্য-উদর পুরোনো সিলিনডারের বদলে যখন নতুন সিলিনডার আসে, তখন গৃহকর্ত্রী অন্তত একবার গ্যাস লিক করবার আশংকার কথা ভেবে কপাল এবং নাসিকা কুঞ্চন করেন।

সিলিনডারে যে গ্যাস ব্যবহৃত হয়, তা সাধারণভাবে butane এবং propane-এর সংমিশ্রণ। এরা কারবন এবং হাইড্রোজেনের এক একটি যৌগ। উচ্চ চাপে—সে চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৮০ থেকে ১০০ পাউণ্ড—এরা সিলিনডারের মধ্যে সঞ্চিত থাকে তরল অবস্থায়। যেই সিলিনডারের মুখ খোলা হয়, অমনি সেই তরল ফুটতে শুরু করে এবং সিলিনডারের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে গ্যাসীয় রূপ নিয়ে। তখন চাপের পরিমাণ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় $\frac{১}{২}$ পাউণ্ড। নির্গত গ্যাসের সামনে রবারের টিউব এবং রেগুলেটার থাকে। তার সাহায্যে চুল্লীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন হয়।

এই গ্যাস জ্বালাবার জন্যে যা দরকার, তা হল আগুন এবং যথেষ্ট অকসিজেন। গ্যাস যখন জ্বলে তখন বিপদ নেই, কিন্তু না জ্বলা গ্যাস যখন লিক করে বিপদের আশংকা দেখা দেয় তখনই।

সিলিনডারের গ্যাসে বিপদের আশংকা আরও বেশি এই কারণে যে, সে বাতাসের চেয়ে ভারি এবং দ্বিগুণ ভারি। ফলে সে ওপরে ওঠে না। গ্যাস যত লিক করে, মেঝের সঙ্গে সে তত সমান্তরাল-ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর উপযুক্ত পরিমাণ বাতাসের উপস্থিতিতে আগুন দপ করে জ্বলে উঠে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটায়।

সিলিনডারের ব্যবহৃত গ্যাস সাধারণভাবে গন্ধহীন। কিন্তু রন্ধ্রপথে গ্যাস নির্গত হচ্ছে, এটুকু বোঝানোর জন্যে এই গ্যাসের সঙ্গে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে কোনো গন্ধযুক্ত গ্যাসের সংমিশ্রণ ঘটানো হয়। কিন্তু সে গন্ধযুক্ত গ্যাস যে সব সময়ে ব্যবহারকারিণীকে রন্ধ্রের সন্ধান দেয় তা নয়।

এই গ্যাসজনিত দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্যে দু তিনটি বিষয়ের উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়। করণীয় বিষয়গুলি অত্যন্ত ঘরোয়া। হেঁসেলের দায়িত্ব যাঁরা নেন, তাঁরা সকলেই এগুলি অতি সহজেই মেনে চলতে পারেন।

এক ঃ প্রতিদিন সকালে চুল্লী এবং সিলিনডারের মুখ বন্ধ আছে কি না পরীক্ষা করা। যদি বন্ধ না থাকে বা গ্যাস লিক করেছে এমন কোনো আভাস পাওয়া যায়, তাহলে 'বাতাস' করে ঘরটিকে গ্যাস বিমুক্ত করা।

দুই ঃ চুল্লীর রবারের মুখ ঠিকমত আঁটা আছে কিনা পরীক্ষা করা—এটিও প্রাত্যহিক কর্তব্য।

গ্যাসের সিলিনডারের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারিণীদের আর এক ধরনের অভিযোগ এবং পরামর্শ আছে। তা হল গ্যাসের মিটার। গ্যাস যখন শেষ হয় তখন তা প্রায় হঠাৎই শেষ হয়, তার বিশেষ পূর্বাভাস পাওয়া যায় না। গ্যাস যদি শনিবার অপরাহ্লেই ফুরিয়ে আসে, তাহলে গৃহিণীর চক্ষুস্থির। শনিবার শেষ বেলা, আর কিছু করণীয় নেই। রবিবার ছুটি, চুল্লী শীতল হলেও দেহের ক্ষুধা আছে এবং সোমবারের প্রথম বেলাটুকুও ওই রকমই। ফলে গ্যাসের মিটারই অনিশ্চিত অবস্থার এক স্থায়ী সমাধান করতে পারে বলে তাঁরা মনে করেন।

কিন্তু নির্গত গ্যাসের চাপকে অবলম্বন করে মিটার বসানো অসম্ভব। কারণ গ্যাস শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নির্গত হয় প্রায় সমচাপে। অন্য উপায় অবশ্য আছে। তা হল গ্যাসের ওজন। সিলিনডারের প্রায় ৳ ভাগ তরল গ্যাসে ভর্তি থাকে এবং তার ওজন প্রায় ১৫ কিলোগ্রাম। সিলিনডারের সঙ্গে যদি ওজন নির্ণয়ের ব্যবস্থা থাকে তাহলে গ্যাস শেষ হয়ে আসছে বোঝা যাবে ওজনের কাঁটা দেখে। গ্যাসের নিয়মিত ব্যবহার এবং সেই সঙ্গে ওজনের কাঁটার ধারাবাহিক অধোগতি ব্যবহারকারিণীদের সচেতন করে তুলবে—গ্যাস বদলের সময় আসন্ন। কিন্তু বর্ধিত প্রাথমিক ব্যয়ের আশংকায় এটি এখনও বাস্তবে রূপায়িত হয়নি।

সব দেশের মত আমাদের দেশেও আবহাওয়া সংক্রান্ত আলোচনা চিরকালের।

শীতকালে যেমন শৈত্যের তীক্ষ্ণতা গ্রীষ্মকালে তেমনই উত্তাপের প্রচণ্ডতা। এই প্রচণ্ডতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে শারীরিক অস্বস্তি বৃদ্ধি পাবে, তা ঠিক। কিন্তু কেবলমাত্র গ্রীষ্মের উত্তাপের উপরেই শারীরিক অস্বস্তি নির্ভর করে, এমন কথা বলা চলে না। উত্তাপ তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে বাতাসের আর্দ্রতা। তাই কখনো কম গরমে এবং বাতাসের বেশি আর্দ্রতায় আমরা ঘর্মাক্ত কলেবরে যে পরিমাণ অস্বস্তি বোধ করি, কম আর্দ্রতায় এবং উত্তাপ বৃদ্ধিতে অনেক ক্ষেত্রে ঠিক সম পরিমাণ অস্বস্তি বোধ করি না। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা গ্রীষ্মকালে এই উত্তাপ এবং আর্দ্রতার মিলিত প্রভাবে মানুষের অস্বস্তির পরিমাণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য নাম টম—বিদেশী বিজ্ঞানী, তিনি উত্তাপ এবং আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে মানুষের অস্বস্তিবোধের একটি সূচক নির্ণয় করেন।

বুদ্ধিগ্রাহ্য সহজ গণনা পদ্ধতি—গ্রীষ্মের উত্তাপ এবং বাতাসের আর্দ্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সূচক সংখ্যার উন্নতি এবং উত্তাপ ও আর্দ্রতার পরিমাণ কমার সঙ্গে সূচক সংখ্যার অবনতি ঘটে। তা ছাড়া একই উত্তাপে বাতাসের আর্দ্রতা হ্রাস পেলে সূচক নেমে আসে। ফলে উত্তাপের তারতম্য না ঘটলেও অস্বস্তির মাত্রা কমে। এই সূচক সংখ্যা অনুসারে ৭০ পর্যন্ত আমাদের আবহাওয়া সংক্রান্ত অনুভূতি স্বাভাবিক। সূচক সংখ্যা ৭০-এর উর্ধ্বে উঠলেই অস্বস্তির সূত্রপাত এবং ৭০ থেকে ৭৫ পর্যন্ত সূচক সংখ্যার ক্ষেত্রে শতকরা প্রায় ৫০ জনের আবহাওয়ার অনুভূতিতে অস্বস্তি বোধ হয়। পরবর্তী পর্যায় ৭৫ থেকে ৮০-এর মধ্যে। তখন অস্বস্তির মাত্রা আরও বেশি এবং তা প্রায় সার্বজনীনতার পর্যায়ভুক্ত; এবং যেই সূচক সংখ্যা ৮০-এর উর্ধ্বে উন্নীত হয়, তখন অবস্থা অনেক গুরুতর আকার ধারণ করে।

এখানে একটা দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি অনুধাবন করা সহজ হবে। শহরের উত্তাপ যদি ১০০ ডিগরি ফারেনহাইটে পৌঁছোয় আর বাতাসের আর্দ্রতা যদি থাকে শতকরা ১০০ ভাগ তা হলে অস্বস্তির মাত্রা কত ?

সহজ হিসেবে তখন সূচক সংখ্যায় অস্বস্তির মাত্রা ৯৫। এখানে বাতাসে আর্দ্রতার মাত্রা শতকরা ১০০ ভাগ—এ একেবারে একটা আদর্শ স্থানীয়। ফলে সাধারণ ক্ষেত্রে আর্দ্রতার পরিমাণ কম থাকে এবং তা যত কমে, ততই অস্বস্তির সূচক-সংখ্যা নেমে আসে এবং উত্তপ্ত আবহাওয়ার পরিবেশ সত্ত্বেও আমরা অনেকটা স্বাভাবিক থাকতে পারি।

আমাদের ভারতবর্ষেও কলকাতা, দিল্লী এবং নাগপুরকে নিয়ে এই সূচক ভিত্তির একটি পরীক্ষা করেছেন দুজন ভারতীয় বিজ্ঞানী—এস পি ভেঙ্কটেশ্বরন এবং এম এস স্বামিনাথন। এঁদের পরীক্ষার ফলাফলও টমের মতামতের অনুরূপ। এঁরা বলেছেন, সূচক-সংখ্যা ৭৯ পর্যন্ত আমাদের আবহাওয়া সংক্রান্ত অস্বস্তির মাত্রা সহনযোগ্য।

আমাদের কলকাতা শহরে গরমে আমরা সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাই মে মাসে। মার্চ মাস থেকেই সূচক-সংখ্যা ৮০-এর ঊর্ধ্বে উন্নীত হবার প্রবণতা দেখায়। কিন্তু সে প্রবণতা বেশি সময়ের জন্যে নয়। মোটামুটি তখন তার স্থিতি কম বেশি ৬০ ঘণ্টা। এপ্রিলে তা লাফিয়ে ওঠে ৩০০ ঘণ্টায়, মে মাসে প্রায় ৫০০ ঘণ্টার কাছাকাছি। এর পর জুন মাস। বর্ষা নামবার সময়। ফলে সমুদ্রোত্থিত বাতাসে বর্ধিত বায়ুর আর্দ্রতা সত্ত্বেও তাপমাত্রা কিছুটা হ্রাস পায় বলে অস্বস্তির পরিমাণ খানিকটা নেমে আসে।

অস্বস্তি বোধের ক্ষেত্রে এক মাসে যত ঘণ্টার কথা বলা হয়েছে তার অধিকাংশই সময়ের হিসেবে বেলা দশটা থেকে বিকেল ছটা পর্যন্ত। সুতরাং ওই সময়েই অস্বস্তির সূচক সবচেয়ে বেশি ৮০-এর ঊর্ধ্বে অবস্থান করে।

গ্রীষ্মের উত্তাপ আমরা অনুভব করি মার্চ, এপ্রিল এবং মে মাসে

ও জুনের প্রথমার্ধে, বর্ষা নামবার আগে পর্যন্ত। এর মধ্যে মার্চ মাসে অস্বস্তি বোধের সময় বেশি নয়। শুধু তাই নয়, মার্চ মাসে এমন একটা উল্লেখযোগ্য সময় আমরা পাই যখন আবহাওয়ার পরিমণ্ডলে আমরা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, সুস্থ, ক্লান্তিহীন এবং অস্বস্তির প্রভাব থেকে মুক্ত। এই সময়ে সূচক-সংখ্যা অনূর্ধ্ব ৭০। মার্চ মাসে এই রকম সময় ১৫০ থেকে ২০০ ঘণ্টার মধ্যে। এপ্রিল মাসেও এই রকম কিছুটা সময় আছে। কিন্তু মার্চ মাসের তুলনায় সে পরিমাণ অনেক কম। তখন তার স্থিতি সাধারণত ৩০ থেকে ৪০ ঘণ্টা।

মার্চ, এপ্রিলের পর মে থেকে অক্টোবর মাস—কলকাতা শহরে বছরের এই পরবর্তী ছটি মাস স্বস্তিবিহীন। তখন সূচকের মাত্রা সচরাচর ৭০-এর নীচে নয়। এর মধ্যে এপ্রিল, মে এবং জুন মাসের প্রথমার্ধে চূড়ান্ত অবস্থা। তারপর আকাশ কালো করে বর্ষা নামা পর্যন্ত চূড়ান্ত অস্বস্তি নিঃসন্দেহে কমে আর সে কমে আসা ধারাবাহিকতা বজায় রাখে পরবর্তী অক্টোবর পর্যন্ত।

যাই হোক, বর্ষার কথা বাদ দিয়ে, এপ্রিল এবং মে মাসের মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখি।

গত ১০ বছরে এপ্রিল এবং মে মাসে ফারেনহাইটে গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ঃ

	এপ্রিল	মে
১৯৭১	৯০·৩২	৯২·৮৪
১৯৭২	৯৭·১৬	৯৯·৮৬
১৯৭৩	৯৯·৮৬	৯৩·৯২
১৯৭৪	৯৩·৭৪	৯৪·৪৬
১৯৭৫	৯৬·২৬	৯৭·৭
১৯৭৬	৯৭·১৯	৯৫
১৯৭৭	৯৩·৫৬	৯২·৬৬
১৯৭৮	৯৫·৯০	৯৫·৭২
১৯৭৯	৯৬·৪৪	৯৯·৫০
১৯৮০	৯৭·৮৮	৯৬·৪৪

এখন এই সর্বোচ্চ তাপমাত্রার সঙ্গে যদি বাতাসের আর্দ্রতাকে নিয়ে আসা যায় তা হলে দেখতে পাওয়া যাবে এপ্রিল-মে মাসে উত্তাপের তেমন পার্থক্য না থাকা সত্ত্বেও আর্দ্রতার হেরফেরের জন্য মে মাসই কলকাতা শহরে চূড়ান্ত অস্বস্তিসূচক মাস হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

এপ্রিল ও মে মাসের বিভিন্ন সন্ধ্যায় বাতাসের গড় আর্দ্রতা (শতকরা হিসেবে):

	এপ্রিল	মে
১৯৭১	৬৮	৭১
১৯৭২	৫৬	৬১
১৯৭৩	৫৭	৬৯
১৯৭৪	৬৭	৬৬
১৯৭৫	৬৭	৬৬
১৯৭৬	৫৩	৬৭
১৯৭৭	৭২	৭২
১৯৭৮	৬০	৭১
১৯৭৯	৪৫	৫২
১৯৮০	৬১	৬৮

তাহলে এপ্রিল মাসের তুলনায় মে মাসের সন্ধ্যায় বাতাসের আর্দ্রতা তুলনামূলকভাবে বেশি। এই আর্দ্রতার পার্থক্যের জন্যে উত্তাপের তেমন তারতম্য না হওয়া সত্ত্বেও মে মাসে গ্রীষ্মের অস্বস্তি আমরা বেশি অনুভব করি।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গ্রীষ্মকালে এই অস্বস্তিবোধ সংক্রান্ত সূচক নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে। টুরিস্টরা যাতায়াত করেন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। অপরিচিত একটি দেশ সম্পর্কে যত জিজ্ঞাসা তার মধ্যে আবহাওয়া সংক্রান্ত কৌতূহল একটি উল্লেখ-যোগ্য প্রশ্ন। শুধু টেম্পারেচার চার্টেই তার উত্তর নেই। সেখানে প্রয়োজন উত্তাপ এবং আবহাওয়ার মিলিত শক্তিতে প্রস্তুত অস্বস্তিবোধ সংক্রান্ত সূচক বা Discomfort index। তবেই সেখানকার আবহাওয়ার বিশ্বাসযোগ্য পরিচয় পাওয়া যায়।

পেপটিক আলসারে কি পান খাওয়া চলতে পারে?

সাধারণভাবে আমরা জানি যে, পরিপাকের সহায়তায় পানের একটি ক্রিয়া আছে। ফলে নীরোগ মানুষের বেলায় পানের ব্যবহারে আপত্তির কারণ না থাকতে পারে, কিন্তু পেপটিক আলসারে যিনি ভুগছেন তাঁর ক্ষেত্রে পান খাওয়ার বিধিনিষেধ কিছু আছে কি?

আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় সাধারণ পরিপাকে যদি সে সহায়তা করে তাহলে পেপটিক আলসারে আপত্তির কি থাকতে পারে? কিন্তু বিজ্ঞানে আপাত চিন্তার কোনো স্থান নেই। ফলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

পান এবং পেপটিক আলসার সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষা চলে ল্যাবরেটরিতে জনপ্রিয় অবলম্বন গিনিপিগ নিয়ে এবং মানুষের উপরেও। পান পাতার রসে মানুষের পাকস্থলীর এসিড দেখা গেল অনেক বাড়ে, এমন কি গিনিপিগের পাকস্থলীতে আলসারও হল। পেপটিক আলসারের ক্ষেত্রে একটা নিষেধাজ্ঞা—বেশি এসিড সৃষ্টি হয় এমন জিনিস এই রোগে অবশ্যই বর্জনীয়। অতএব পানপাতা নিষিদ্ধ। সাজা পানে অবশ্য শুধু পান পাতা নয়, অন্য জিনিসও থাকে।

সব গবেষণার সূচনাই কিন্তু গবেষকদের মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। পেপটিক আলসার এবং পানের বিষয়টি নিয়ে গবেষণা রোগীদের পান খাব কি খাব না—এই প্রশ্নের সমাধানের উদ্দেশ্যেই আরম্ভ হয়েছিল।

পরমাণু চুল্লীতে জ্বালানি হিসেবে যা ব্যবহার করা হয় তার অবশিষ্ট কোথায় যাবে, কি ভাবে বিন্যস্ত হবে—সব দেশেই এ আজও একটি গুরুতর সমস্যা। অথচ পরমাণু চুল্লীর ব্যবহার সর্বত্রই বেড়ে চলেছে দিনে দিনে। বিদেশে এবং আমাদের দেশেও।

জ্বালানি হিসেবে প্রথম ব্যবহারের পরে যা থাকে, তাই কিন্তু প্রকৃত অবশিষ্ট নয়। তার মধ্যে কিছু অবশিষ্ট জ্বালানি থাকে এবং তখন প্লুটোনিয়াম-২৩৯ নামে একটি নতুন ধরনের জ্বালানি তৈরি হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অব্যবহৃত জ্বালানি এবং প্লুটোনিয়াম-২৩৯ সরিয়ে নেওয়ার পরে যা অবশিষ্ট থাকে তাই হল আসল অবশিষ্ট।

এই অবশিষ্টাংশের তেজস্ক্রিয়তা এত বেশি যে প্রচলিত আবর্জনা বর্জনের যত পদ্ধতি তা এখানে অচল। তরল এই আবর্জনা—সাধারণভাবে মাটির তলায় ট্যাঙ্কের মধ্যে সংরক্ষিত হয়। এ সংরক্ষণ এক সাময়িক ব্যবস্থা, যার স্থায়িত্ব মাত্র ১৫ থেকে ২০ বছর। তারপর? তাছাড়া পদ্ধতি নিরাপদও নয়। ভূমিকম্প আছে, আছে বিস্ফোরণ। যদি কোনো কারণে পরিত্যক্ত তরল ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে সমস্ত প্রকৃতি এবং পরিবেশও তেজস্ক্রিয়তায় আচ্ছন্ন হবে।

আবর্জনার স্থায়ী সংরক্ষণে প্রয়োজন দেড় হাজার থেকে দু হাজার বছর। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন তরল হিসেবে নয়, তেজস্ক্রিয় আবর্জনাকে কাচের 'অ্যাটমিক স্ট্রাকচারে' রূপান্তরিত করে ভূগর্ভে সংরক্ষণ করা প্রকৃষ্ট উপায়। ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেনটারে যে উচ্চ তেজস্ক্রিয় আবর্জনা তৈরি হয়, তাকে কাচ গঠনকারী রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে উচ্চ তাপে এই কাচে পরিণত করার এক সফল প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

এ ধরনের সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিরাপদ। কারণ এই কাচের বিশেষ গুণ: জলের সংস্পর্শে এলেও তেজস্ক্রিয় পদার্থ এই কাচ থেকে বেরিয়ে যায় না।

দীর্ঘকাল এর অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

করোনারি থ্রমবোসিস কি ভাবে এড়াব ?

প্রত্যেক যুগেই দু একটি রোগ সেই যুগের প্রতি চ্যালেন্‌জস্বরূপ। এ যুগে সে রকম একটি রোগ করোনারি থ্রমবোসিস। সাধারণতঃ 'হার্ট অ্যাটাক' বলতে আমরা যা বুঝি, ডাক্তারি শাস্ত্রে তাই 'করোনারি অকলুসন' বা সহজ ভাবে 'করোনারি থ্রমবোসিস' নামে পরিচিত।

সাধারণতঃ চল্লিশোর্ধ্ব যাঁরা, বুদ্ধিজীবী, মননশীল, চিন্তাবান ব্যক্তি হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত বা অল্প কথায় সমাজের উন্নত শ্রেণীর মানুষ হিসেবে যাঁরা চিহ্নিত, তাঁরাই এই রোগটিতে বেশি আক্রান্ত হন। মহিলাদেরও এই রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। তবে তা ৪৫ উর্ধ্ব বয়সে—সন্তানধারণ ক্ষমতা চলে যাবার পরে।

করোনারি থ্রমবোসিস—রোগটির বিবরণ কি? এ সম্পর্কে আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা হল এই যে, রোগটিতে করোনারি ধমনী জমাট বেঁধে আসে, যে ধমনী হৃদ্‌যন্ত্রে রক্ত সরবরাহ করে।

ফলে নির্দিষ্ট পথ দিয়ে পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ সম্ভব হয় না এবং কখনো কখনো রক্ত সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। এই হল করোনারি থ্রমবোসিস বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদন। রোগ লক্ষণের ক্ষেত্রে ধমনীপথ ধীরে ধীরে রুদ্ধ হতে পারে বা দ্রুতগতিতে, এবং তার ভিত্তিতেই আমরা বলব যে রোগটির আক্রমণ মৃদু বা গুরুতর, আকস্মিক বা ধারাবাহিক।

এই মারাত্মক এবং কঠিন রোগটির লক্ষণ কি? কোন্ কোন্ লক্ষণ দেখে বুঝব যে, এই রোগটিতে আমি আক্রান্ত হতে চলেছি, বিপদ আসন্ন? এবং এই রোগটির আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করব?

করোনারি থ্রমবোসিসের বিভিন্ন প্রাথমিক লক্ষণ কি?

তাড়াতাড়ি কাজ করবার সময়ে বা দৌড়ে যাওয়া আসা বা

ট্রামে বাসে ওঠার সময়ে বুকে ব্যথা অনুভব, দাঁড়ালে বা বিশ্রামে সে ব্যথার উপশম। সাধারণত বাঁ হাত ঝিমঝিম করে—হৃদযন্ত্রে যে রক্ত চলাচল কম হচ্ছে এটা তারই বহির্লক্ষণ। কখনো কখনো ডান হাতও। প্রাথমিক লক্ষণ এই রকম না হয়ে অন্য ধরনেরও হতে পারে। অনেক সময়ে অম্বল, বমি বমি ভাব দিয়েও শুরু হয়। বুকে ব্যথা না থাকাও সম্ভব। এর সঙ্গে ঘাম এবং রক্তের চাপ নিম্নমুখী দেখা গেলে করোনারি থ্রমবোসিস সন্দেহ করা উচিত। এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করে Electro-cardio-gram-এর সাহায্যে দেখা দরকার, করোনারি রক্ত সরবরাহ কমের কোনো লক্ষণ আছে কি নেই।

করোনারি থ্রমবোসিস এড়িয়ে চলার জন্যে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত?

বিধি নিষেধের একটি তালিকা নীচে সন্নিবেশ করা হল। যাঁদের বয়স ৪০ এর কাছাকাছি বা তার বেশি তাঁদের বিভিন্ন বিধি নিষেধের উপরে বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে:

১। স্থূলত্ব পরিহার।

২। ধূমপান নিষেধ।

৩। চর্বিজাতীয় খাদ্য কম খাওয়া।

৪। সাধারণ ব্যায়াম, হাঁটা-চলা বা শারীরিক পরিশ্রম—শরীরকে সুস্থ রাখার জন্যে কিছুটা করা দরকার।

৫। গুরু ভোজনের পরে বিশ্রাম নেওয়া উচিত এবং তখন ভারি কাজ করা ঠিক নয়।

৬। কোনো অনুষ্ঠানে হঠাৎ একদিন অতিরিক্ত ভোজন ভাল নয়।

৭। অ্যালকোহল ভাল—কিন্তু বিশেষ ভাবে মনে রাখা প্রয়োজন, তা অবশ্যই পরিমিত মাত্রায়।

৮। যাঁদের বংশে করোনারি রোগ আছে তাঁদের এই সতর্কতা নির্দেশ ভালোভাবে মেনে চলা দরকার বা আরও কম বয়স থেকে

মানা বাঞ্ছনীয়! কারণ করোনারি থ্রমবোসিস বংশগত রোগও বটে। কোনো বংশে থাকলে পরবর্তী ধারায় বেশি দেখা যায়।

৯। যাঁদের বহুমূত্র রোগ আছে তাঁদের এই রোগ বেশি হয়। ফলে রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে তাঁদের এই সব বিধি নিষেধ আরো কঠোর ভাবে মানতে হবে।

বিশেষজ্ঞেরা রোগ প্রতিরোধের বিভিন্ন উপায় মেনে চলার সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা সকলকেই মনে রাখতে বলেন যে হৃদ্‌যন্ত্রকে সুস্থ রাখার জন্যে হাঁটার চেয়ে ভাল ওষুধ আর কিছু নেই—২ থেকে ৩ মাইল রোজ একটানা। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে সকলকেই এই পরিমাণ হাঁটতে হবে। না ঘেমে, না হাঁফিয়ে যিনি যতটুকু পারবেন, তিনি ততটুকুই হাঁটবেন।

করোনারি থ্রমবোসিস সাধারণভাবে ৪০-উর্ধ্ব রোগ হিসেবে পরিচিত হলেও, আজকাল ২০/৩০ বছরেই এই রোগ হতে দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া সমাজের শুধু উন্নত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে নয়, মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারেও এই রোগের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বর্তমানে করোনারি থ্রমবোসিসে যাঁরা আক্রান্ত হচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের। সাধারণত একঘেয়ে গতানুগতিক কাজ যাঁরা করেন, ধূমপান এবং খাদ্যে হাইড্রোজেনেটেড তেল তাঁদের মধ্যে এই রোগ নিয়ে আসে। হাইড্রোজেনেটেড তেলের বদলে বাদাম তেল বা সরষের তেল ভাল। কিন্তু নারকেল তেল নয়। এক কথায় শীতে যে তেল জমে যায় তা ব্যবহার করা উচিত নয়।

করোনারি থ্রমবোসিস সম্পর্কে আমাদের একটি ভুল ধারণা আছে। আমরা সাধারণ মানুষ মনে করি, করোনারি থ্রমবোসিসের বিভিন্ন স্ট্রোকের ক্ষেত্রে পরবর্তী স্ট্রোকগুলি বেশি বিপজ্জনক।

কিন্তু আমাদের এ ধারণা অমূলক এবং এর পিছনে কোনো বৈজ্ঞানিক কারণ নেই।

হৃদ্‌যন্ত্রের প্রথম আক্রমণেই আক্রান্তের মৃত্যু ঘটতে পারে।

আবার নাও হতে পারে। আক্রমণের গুরুত্বের উপরেই তা নির্ভর করে। কিন্তু একটা হিসেব নিয়ে দেখা গেছে যে, সাধারণত শতকরা ৮৫ ভাগ ক্ষেত্রে ফারস্ট স্ট্রোক মারাত্মক নয় বা রোগী সে ধাক্কা সহ্য করতে পারেন।

ফারস্ট স্ট্রোক যাঁরা সহ্য করেন এবং বেঁচে থাকেন, পরবর্তী স্ট্রোক তাঁদের পক্ষে মারাত্মক হবে এমন কথা ঠিক নয়। বরং প্রথম মৃদু অথবা মাঝারি স্ট্রোকের পরে অনেক সময়ে প্রাকৃতিক নিয়মে হৃৎপিণ্ডে আরও ধমনী সৃষ্টি হয়। দেহ যে শুধু চিকিৎসকেরা রক্ষা করেন না, প্রকৃতিও দেহকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক রাখার জন্যে সহায়তা করে এখানে তার পরিচয় পাওয়া যায়। নতুন ধমনী বিকল্প সরবরাহ পথ হিসেবে কাজ করে এবং রোগীর রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে। তবে নতুন ধমনী পথ সক্রিয় হতে মাসখানেকের মত সময় লাগে। এই বিকল্প পথ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে রোগীর পরবর্তী কোনো আক্রমণ নাও হতে পারে।

চিকিৎসকেরা বলেন যে, করোনারি থ্রমবোসিস আক্রমণে সম্পূর্ণ রোগ নিরাময় এবং ভবিষ্যৎ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে শুধু ঔষধ যথেষ্ট নয়। সেই সঙ্গে প্রয়োজন হাঁটা-চলা জাতীয় ব্যায়াম—নিয়মিত এবং নিয়মমত। এই ব্যায়াম নতুন ধমনী সৃষ্টিতে হৃদ্‌যন্ত্রকে সাহায্য করে।

করোনারি থ্রমবোসিস মারাত্মক একটি রোগ বলে আমাদের ধারণা। শুধু বুদ্ধিজীবীদের নয়, সমাজের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারকেও তা স্পর্শ করেছে। অথচ এই রোগটি সম্পর্কে আমরা নিজেদের সম্পূর্ণ অসহায় মনে করি। কিন্তু না, তা নয়, এ রোগও প্রতিরোধ করা চলে। একটি পরিমিত জীবন যাপনের চেষ্টা করতে হবে এবং উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুর্ভাবনা বর্জন করে চলার কথা একটু ভাবতে হবে।

সমগ্র পৃথিবীতে অন্ধ মানুষের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। এর মধ্যে ভারতবর্ষে দৃষ্টিহীনের সংখ্যা কত? শুনলে অবাক হওয়ার কথা, কেবলমাত্র আমাদের ভারতবর্ষেই প্রায় ৪৫ লক্ষ অন্ধ আছেন। ভারতবর্ষে অন্ধত্বের কারণ বিবিধ। তার মধ্যে আছে সাধারণের অজ্ঞতা, কুশিক্ষাগত সংস্কার এবং পুষ্টির অভাব। এ ছাড়া হাতুড়ে চিকিৎসাও অনেক ক্ষেত্রেই অন্ধত্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অন্ধত্ব প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখের প্রয়োজন, সেটি ভেজাল। ভেজাল খাদ্য অনেক সময়ে চক্ষুরোগ এবং অন্ধত্ব নিয়ে আসে। মহামারী হিসেবে কখনো কখনো এক ধরনের গ্লুকোমা রোগ দেখা যায় যা দৃষ্টিশক্তিকে লুপ্ত করে। এই রোগের কারণ সরষের তেলে ভেজাল। এর চেয়েও মারাত্মক—ভেজাল এ্যালকোহল। এই এ্যালকোহল গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টি এমন কি জীবন হানিও হতে পারে।

চক্ষুরোগের ক্ষেত্রে আর একটি সমস্যা সাম্প্রতিক কালে উদ্ভুত হয়েছে। এটি হল চশমার ক্ষেত্রে কৃত্রিম কাচের ব্যবহার। এই কৃত্রিম কাচ, ভাবতে অবাক লাগে, জানালায় দরজায় যে স্বচ্ছ কাচ ব্যবহার করা হয়, সেই কাচ। আমাদের এ অঞ্চলে গ্লাস ফ্যাকটরি স্থাপিত হওয়ার পরে বিদেশ থেকে চশমার কাচ আমদানি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। কিন্তু সে চশমার কাচের মূল্য চড়া—এই যুক্তিতে এক শ্রেণীর বাবসায়ী তা তেমনভাবে গ্রহণ করতে চাচ্ছেন না। ফলে উৎপন্ন চশমার কাচ বিদেশে রপ্তানী করা হচ্ছে। আর সেই সুযোগে কৃত্রিম চশমার কাচে বাজার ছেয়ে চলেছে। কিন্তু চশমার ক্ষেত্রে কৃত্রিম কাচের ব্যবহার মারাত্মক। চোখের উপরে স্বাভাবিক ভাবেই সে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া নিয়ে আসে। তখন নানা রকম চক্ষুরোগের উপসর্গ দেখা দেয়।

যে অবলম্বন নিরাময়ের জন্যে, তারই যদি চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ সরষের মধ্যেই যদি ভূত ঢোকে তাহলে তার চেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা আর কি থাকতে পারে?

আবহাওয়ার নির্দেশের ক্ষেত্রে এখন আমাদের প্রথম এবং প্রধান অবলম্বন রেডার। দমদমে ৩ সেন্টিমিটার দুটি রেডার যন্ত্র আছে। ৩ সেন্টিমিটার তরঙ্গযুক্ত রেডার বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়বৃষ্টি নির্দেশে সক্ষম। পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে বাতাসের গতি-প্রকৃতি, ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা, বজ্রবিদ্যুতের আশঙ্কা ৩ সেন্টিমিটার তরঙ্গের রেডার যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা চলে।

৩ সেন্টিমিটার রেডার কিন্তু ঘূর্ণিঝড় নির্দেশের সহায়ক নয়। তখন ১০ সেন্টিমিটার তরঙ্গযুক্ত রেডারের প্রয়োজন। প্রবল বর্ষণসহ ঘূর্ণিঝড় মারাত্মক। কিন্তু বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়বৃষ্টিতে জীবননাশের বা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির তেমন কোনো আশঙ্কা থাকে না। যদিও আকাশচারী বিমানের ক্ষেত্রে তা অপরিহার্য। সকলের কাছে যা সর্বগ্রাসী এবং ভয়াবহ তা হল ঘূর্ণিঝড়।

বর্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় নির্দেশের উপযুক্ত ১০ সেন্টিমিটার তরঙ্গযুক্ত ৫টি রেডার আছে। কলকাতা, পারাদ্বীপ, বিশাখাপত্তনম, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই। কলকাতায় এটি আছে ষ্ট্রাণ্ড রোডে নয়ামহাকরণে। ১৩ তলা বাড়ির মাথায় আরও ৩ তলা। সেখানে স্তম্ভের উপরে এটির অবস্থান। গোয়ায়, মসলিপত্তনমে এবং কারাইক্কলে আরও ৩টির স্থাপন সম্পূর্ণ হওয়ার পরে ভারতবর্ষের সমস্ত তটভাগই ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাসে নিরাপদ হয়ে উঠবে। এটির অস্তিত্ব ধরা পড়ার পরে পৌঁছোতে সময় নেয় দেড় দিনের মত। সমুদ্র তটবর্তী মানুষকে এই সময়ের মধ্যে নিরাপদ অঞ্চলে নিশ্চয় নিয়ে আসা চলে।

ঘূর্ণিঝড়ের নির্দেশ পাওয়া যায় সমুদ্রে ভাসমান জাহাজ থেকে। আন্তর্জাতিক রীতি অনুসারে কোনো জাহাজ ঘূর্ণিঝড়ের অস্তিত্ব লক্ষ্য করলে তা নিকটবর্তী দেশে প্রেরণ করে। সেখান থেকে সে বার্তা সন্নিহিত দেশসমূহে প্রেরিত হয়। পদ্ধতিটি সময়সাপেক্ষ এবং এটিকে

সুষ্ঠুও বলা চলে না। বর্তমানে বিজ্ঞানের আশীর্বাদে পদ্ধতিটি রেডারযন্ত্র ও আবহাওয়া উপগ্রহের সাহায্যে নবরূপায়িত হয়েছে। ফলে আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনেক সুষ্ঠুভাবে এবং সঠিকভাবে পরিবেশন সম্ভব হচ্ছে। ভবিষ্যতে পোর্টব্লেয়ারে একটি রেডার স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। পোর্টব্লেয়ার এমন একটি অঞ্চল যেটিকে প্রায় সমস্ত ঘূর্ণিঝড়েরই উৎপত্তিস্থল বলা চলতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে তারা সেখানেই গঠিত হয়। ফলে এটি স্থাপিত হলে ভারতবর্ষের পূর্বতটে যে সব ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবের সম্ভাবনা, সেগুলি অঙ্কুরেই অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসে আর একটি অবলম্বন হল আবহাওয়া স্যাটেলাইট। আবহাওয়া স্যাটেলাইটে যে টেলিভিশন ক্যামেরা আছে, তা থেকে মেঘের ছবি তোলা হয়। সেই চিত্ররূপের বিশ্লেষণই ঘূর্ণিঝড়ের কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা এ সম্পর্কে নির্দেশ দেয়। ঘূর্ণিঝড়ের সময় বায়ুর গতি ঘড়ির কাঁটার বিপরীতমুখী গতি নেয়। বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে মেঘপুঞ্জও ঘূর্ণিত হবে। এবং সেই চিত্র স্যাটেলাইটের মাধ্যমে পৃথিবীতে এসে পৌঁছোবে। সেই চিত্ররূপ ঝড়ের অবস্থান, তার প্রকোপ, তার গতিপথের সম্ভাবনা সম্পর্কে আভাস দেবে।

ভারতবর্ষে কলকাতা, গৌহাটি, মাদ্রাজ, দিল্লী, বোম্বাই, পুণা—এই ছটি স্থানে এ পি টি (অটোমেটিক পিকচার ট্রান্‌সমিশন ইকুয়িপমেণ্ট) সরঞ্জাম আছে। উপগ্রহ মারফত পাঠানো মেঘের চিত্ররূপ গৃহীত হয়। কলকাতায় প্রতিদিন সকালে এবং সন্ধ্যায় মেঘের দুটি চিত্ররূপ ধরা পড়ে। বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে স্যাটেলাইটের যাওয়ার পথে এই চিত্ররূপ গ্রহণ করা হয়।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস বর্তমানে কতটা উন্নত হয়েছে? গত কয়েক বছর আমরা আবহাওয়া উপগ্রহের সাহায্য পাচ্ছি এবং এখন ১০ সেন্টিমিটার রেডারেরও সাহায্য পেয়েছি। এর ফলে সমুদ্রে অনেক দূরে ঘূর্ণিঝড়কে আমরা সঠিকভাবে আজ দেখতে পাচ্ছি, তাকে

ক্রমাগত অনুসরণ করে তার গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারছি এবং জনসাধারণকে অনেক আগেই সতর্ক করে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস যে সঠিক হল এবং মানুষের জীবন রক্ষা যে সম্ভব হল—এগুলি বিচার করে কিন্তু জনসাধারণ আবহাওয়ার পূর্বাভাসের তারিফ করেন না। তাঁদের বিচারের মাপকাঠি স্থানীয় আবহাওয়ার পূর্বাভাস। ধরা যাক, স্থানীয় পূর্বাভাসে বলা হল আজ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। স্থানীয় পূর্বাভাস কলকাতাকে কেন্দ্র করে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত কার্যকর। ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস অর্থ এই নয় যে, খাস কলকাতাতেই বৃষ্টি হবে। বৃষ্টি বারুইপুরে হতে পারে, না হলে বসিরহাটে, বাগনানে হওয়াও অসম্ভব নয়। আবহাওয়ার পূর্বাভাস সঠিক হল কিনা মিলিয়ে দেখার জন্য ৫০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধযুক্ত সমগ্র অঞ্চলটি দেখা দরকার।

তা ছাড়া আরও একটা কথা আছে। মানুষের মনের গঠন এ রকম যে নিজের দুর্ভোগের কথা সহজে সে ভুলতে পারে না। যদি কোনও দিন এ রকম হয় যে পূর্বাভাসে নির্মেঘ দিন বলা সত্ত্বেও ঝড়বৃষ্টি নামে এবং কেউ বিপর্যস্ত হন তাহলে সে দুর্ভোগের অভিজ্ঞতা ভোলা কঠিন। কিন্তু যেদিন আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হল, দিনটি নির্মেঘ হবে এবং সত্যিই দিনটি সেইভাবে কাটল—সেই দিনটিকে কিন্তু কেউ মনে রাখে না।

তৈলবীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে এখন আমাদের নতুন করে দৃষ্টি পড়েছে স্থূর্যমুখী ফুলের উপরে। অনিন্দ্যসুন্দর ফুলখানি—খোঁপা বাঁধা মেয়েদের মাথার নীরব সহচরী, কিন্তু ব্যবহার্য তৈল উৎপাদনের সে এক আদর্শ উপকরণ। রক্তে হৃদ্‌যন্ত্রের পক্ষে সেই মারাত্মক বস্তু কোলেসটেরোলের মাত্রা বাড়বে না এর ব্যবহারে। এর থেকে হৃদ্‌রোগের আশঙ্কা কম। পরিপাকের সহায়ক হিসেবেও স্থূর্যমুখীর উপযোগিতা দেখা যায়। ভেজিটেবল ঘি উৎপাদনে বাদাম তেলের বিকল্প হিসেবেও এর ব্যবহার চলবে।

স্থূর্যমুখীর তৈলবীজ থেকে খাদ্যে ব্যবহারের উপযুক্ত নিপুণভাবে নিষ্কাষিত তেলে বি-কমপ্লেক্স পর্যায়ের ভিটামিন অপর্যাপ্ত, ক্যাল-সিয়াম যা আছে বাদাম তেলের চেয়ে অনেক সহজে আমাদের দেহে তার সংমিশ্রণ ঘটে। প্রোটিনও উল্লেখযোগ্য—আমাদের দেশের শিশুরা তো সার্বজনীনভাবে অপুষ্টিতে ভোগে—এ প্রোটিন তাদের খাওয়ানো চলতে পারে।

শুধু গুণের বিচারে নয়, ব্যাপকভাবে সে চাষবাসের উপযুক্ত এবং সুলভে লভ্য কিনা তাও হিসেব করে দেখতে হবে। বছরের যে কোনো সময়ে স্থূর্যমুখীর চাষ চলে। গম বা বাদামের তুলনায় তার জলের প্রয়োজনও কম এবং খরচও সব দিক দিয়ে অল্প।

বাইরের চাকচিক্য দেখে ভোলা উচিত নয়।

ভেতরে আর বাইরে সব যদি সমান হত তাহলে সর্বক্ষেত্রেই জটিলতা কমত এবং উপরের নির্দেশনামার উল্লেখের প্রয়োজন ঘটত না। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা এই কথা বলে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ দুয়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য।

খাবারের বেলাতেও এ কথাটা আমাদের মানতে হবে। রঙ্গীন খাবার! রংয়ের তো অভাব নেই—কিন্তু খাবারে সব রং ব্যবহার করা চলে না। বিধি যা আছে তাতে দেখা যায় যে, প্রাথমিক মাত্র এগারোটি রং ব্যবহারের উপযুক্ত। এদের মধ্যে লাল ৫টি, হলুদ ২টি, সবুজ ২টি, নীল ২টি। কিন্তু সেখানেও নিষেধাজ্ঞা আছে। সেই রংও নির্ধারিত মাত্রা অনুসারে বিশুদ্ধ হওয়া দরকার এবং তার ব্যবহারও সীমিত হওয়া প্রয়োজন।

নিশ্চয় অবাক হওয়ার কথা। মাত্র এগারো। একবার যদি মিঠাই-মণ্ডা, লজেনস-টফি, খাদ্যদ্রব্য, শীতল পানীয়ের কথা চিন্তা করা যায়, তাহলে যত রংয়ের কথা মনে পড়বে তা নিশ্চয় এগারোর উপরে এবং অনেক উপরে। হ্যাঁ, ঠিক তাই। সংখ্যা মাত্র এগারো হলে কি হবে রংয়ের বাহারের জন্যে সেগুলির নানারকমের মিশ্রণ ব্যবহার করা চলতে পারে।

ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সরকারি মান অনুযায়ী সমস্ত বিশুদ্ধ খাদ্য রং তৈরি করে চলেছেন। কিন্তু আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি, তার বেশির ভাগেরই রং বিশুদ্ধতার মাত্রা অনুসারে নির্ধারিত নয়। ফলে যা থাকা উচিত তা নেই বলে অধিকাংশই ক্ষতিকারক।

লাল, কাঁচা লাল, কমলা, কেশোরি, বাসন্তী, জাফরন, মেহগিনি —প্রচুর রং পাওয়া যায় বাজারে। এর অধিকাংশই পরীক্ষা করে দেখা গেছে, শরীরের অনিষ্ট সাধন করে। সাধারণ সূতাকে রং করার জন্যে যা প্রয়োগ করা হয় অধিকাংশ খাবারের রংয়ে তারই ব্যবহার। কথাটা সত্য। ফলে অকারণে বাইরের রংয়ে মোহগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়।

না, রাগ করা ভাল নয়। এতে শুধু সামাজিক দিক দিয়ে আমাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, তা নয়, শরীরবিজ্ঞানের দিক দিয়েও রাগ করা আমাদের পক্ষে অনিষ্টকর। বাহ্যত রাগের সময়ে চোখ লাল, কান গরম, ঠোঁট শুকনো, নাসিকা স্ফীত, এসব তো আছেই, তার ওপর আছে ঘাম ঝরা, পায়ের পেশী বিস্তৃত হওয়া, পেশী বিস্তৃতির ধরনটা অনেকটা দৌড়ে পালানোর মত একটা অনুকূল অবস্থার। তাছাড়া রাগের আকস্মিকতায় শারীরিক অত্যাবশ্যক প্রক্রিয়াগুলি গুরুতর রকমে ব্যাহত হয়।

রাগের সময়ে ফুসফুস হয় বিস্তৃত এবং সাধারণ অবস্থার চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয়। তখন ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ে—যে প্রচুর অকসিজেন টানার ফল। দেহ অভ্যন্তরে সঞ্চিত খাদ্যবস্তু থেকে অধিক শক্তি উৎপাদন প্রয়োজন। কাজেই চাই অকসিজেন, ফলে নিঃশ্বাসের দ্রুত গতি। এ অনেকটা শারীরিক পরিশ্রমের মতনই—পরিশ্রম করব, গায়ের জোর না থাকলে সে পরিশ্রম হবে কি করে? রাগও তেমনি, রাগের পিছনেও চাই শক্তির জ্বালানি।

রাগ করলে হৃৎপিণ্ডের কাজ বৃদ্ধি পায়—স্বাভাবিক ক্ষেত্রে মিনিটে ৭২ বার হৃৎপিণ্ডের যে স্পন্দন আমরা শুনতে পাই, সে স্পন্দনের মাত্রা বাড়ে। প্লীহা থেকে রক্তকোষ নিঃসৃত হয় এই সময়ে—এ কেবল রক্তের অকসিজেন পরিবহণশক্তি বৃদ্ধি পায়, সে কারণে। আরও যে শক্তি তা আসে যকৃৎ প্রসূত গ্লাইকোজেন থেকে। রাগ করলে শক্তির প্রয়োজন হবেই আর পরিমাণে গ্লাইকোজেনও বৃদ্ধি পাবে।

রাগের বেলায় আরও চাই, আরও চাই—শক্তির প্রচণ্ড চাহিদা। শরীরের সমস্ত নিহিত শক্তি তখন রাগের পিছনে—ফলে পরিপাক যন্ত্র প্রয়োজন অনুসারে শক্তি পায় না ওই মুহূর্তে। আর তাই যথেষ্ট আশঙ্কা হজমের গোলমালের। তাছাড়া শরীরের কটিদেশে যে গ্ল্যাণ্ড আছে—সেই গ্ল্যাণ্ড তখন অত্যধিক সক্রিয় আর সে এসে চাপ দেয়

নার্ভাস সিস্টেমের উপরে। আর রাগলে মুখ হয় রক্তবর্ণ। তার অর্থ কি ?—মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলের তখন অসাধারণ বৃদ্ধি।

অধিক বোধশক্তিযুক্ত মানুষ যাঁরা, দেখা গেছে সহজেই তাঁদের রাগ করবার কারণ ঘটে। কিন্তু রাগের উপর তাঁদের আশ্চর্য সংযম। ফলে কদাচিৎ রাগের পরিণতিতে বিসদৃশ আচরণের উদ্ভব হয় বা লোক হাসে বা তাঁরা অপদস্থ হন। মুস্কিল মধ্যবর্তী পর্যায়ের লোকেদের নিয়ে—রাগের ক্ষেত্রে তাঁদের আচরণই ঢেউ তোলে বেশি—তখন ক্ষোভ ফেটে পড়ে, বিদ্রোহ, অসন্তোষ ছড়ায়, অশান্তির আগুন জ্বলে।

রাগ আবেগসঞ্জাত ক্ষোভ বা উত্তপ্ত অসন্তোষের প্রকাশ। তার মধ্যে আছে মানুষের প্রতিশোধ লিপ্সা, আছে হতাশার কারণ—তার হোক, কারণে যতই সঙ্গতি থাকুক, তবু রাগকে সংযত রাখা দরকার। তা না হলেই স্বাস্থ্যের হানি, শারীরিক বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা।

ফলে রাগ যদি এড়ানো চলে তো কেন মিছে রাগ করা।

না, মোটা হওয়া ভাল নয়। তাই স্থূলকায়দের সবাইকে ওজন কমানোর জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে।

প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত ক্যালোরি দেহে চর্বি নিয়ে আসে এবং ক্ষয়ক্ষতি করতে পারে। এমনিতে স্থূলত্ব দর্শনীয়ও কিছু নয়। তা ছাড়া মানসিক, শারীরিক নানা ব্যাধি, স্থূলত্বের অনুপাতের সঙ্গে তাদেরও সংখ্যা বৃদ্ধি এবং পরিণতিতে পরমায়ুর উপরে মর্মান্তিক আঘাতের আশঙ্কা। ফলে মেদসর্বস্ব স্থূলকায় ব্যক্তিদের অলস মেজাজে কিছু গলাধঃকরণের পূর্বে একবার অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, সত্যিই কি আমরা ক্ষুধার্ত?

মানুষের বয়স সংক্রান্ত গবেষণায় স্থূলত্বের বিষয়টি বর্তমানে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আজ থেকে প্রায় ৪১ বছর আগে ইঁদুরের উপরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে গবেষকরা দেখেছিলেন যে, নিয়ন্ত্রিত খাদ্যে আয়ুষ্কাল ২০ থেকে ৪০ ভাগ বাড়িয়ে তোলা চলে। তিনদিনের হিসেবে একদিন পুরো খাদ্য, একদিন উপোস। নয়তো ক্যালোরি অনুযায়ী ৬০ ভাগ খাদ্য। পরমায়ুর বৃদ্ধি ঘটে হিসেব ধরে।

মানুষের ক্ষেত্রেই বা নিয়ন্ত্রিত খাদ্যে আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি সম্ভব নয় কেন? উন্নত বিজ্ঞানের যুগ—যদি স্বাভাবিক ক্ষয়ের গতি কমিয়ে আনা যায়, তাহলে নিয়ন্ত্রিত খাদ্য মানুষের আয়ুকে সহজভাবেই ৯০ থেকে ১০০তে উন্নীত করবে।

নীরোগ মানুষের দেহে অতিরিক্ত চর্বিতে যে সব রোগ দেখা যেতে পারে, তার মধ্যে আছে বহুমূত্র, দুশ্চিন্তা, হৃদ্‌রোগ, কিডনীর গোলমাল, বাত এবং আরও অনেক কিছু। মেদ-বাহুল্য শল্য চিকিৎসারও অনুকূল নয়। তা ছাড়া চর্বি তাপের সুপরিবাহী না হওয়ার জন্যে চর্বির আতিশয্য দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণেও অসুবিধা ঘটায়। ফলে দেহে অতিরিক্ত মেদ বা চর্বি, নৈব নৈব চ।

শৈশবে মেদবৃদ্ধি অভিভাবকদের অতিরিক্ত যত্ন এবং খাদ্য গ্রহণের জন্য। পরিণত বয়সে এর কারণ যথেষ্ট পরিশ্রমের অভাব। তা ছাড়া পরিশ্রমের সঙ্গে মেদবৃদ্ধির একটা বিপরীত সম্পর্ক আছে। স্থূলকায় ব্যক্তিদের শরীর সঞ্চালনে অনীহা তুলনামূলকভাবে বেশি। তাঁরা খাদ্যে যে ক্যালোরি গ্রহণ করেন তার যথেষ্ট ব্যয় নেই, ফলে তা মেদ-বৃদ্ধিকারক চর্বিতে রূপান্তরিত হয় এবং দেহের মেদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে।
